দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারত এখন চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাজাঞ্চি
— পৃঃ ২৩

পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির পরিকল্পনা
—পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩।। ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

৪ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে প্রবেশ করল ভারত

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১১ ডিসেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

নজরে 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত আর মমতামুক্ত রাজ্য'
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মোদী কী গ্যারান্টি, দিদি হ্যায় ঘমন্ডি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কর ব্যবস্থায় সুচিন্তিত সংস্কারের কারণে রাজস্ব আদায়ের রেকর্ড
◻ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম ◻ ৮

চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল যা শিক্ষা দিয়ে গেল
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির পরিকল্পনা
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

ক্রিকেটে ভারতের হারে বাংলাদেশের উল্লাস কেন?
◻ গৌতম কুমার মণ্ডল ◻ ১৩

ভারতবর্ষ বীর যোদ্ধাদেরও দেশ ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ১৫

চার রাজ্যের ফলাফলে চব্বিশের রাস্তা প্রশস্ত হলো
◻ শ্যামল কুমার হাতি ◻ ১৮

ভারত এখন চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাজাঞ্চি
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

চার ট্রিলিয়ন অর্থনীতির মাইলফলকের মাধ্যম আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার ◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ২৫

সন্ত কথা : অন্নদা ঠাকুরের দক্ষিণের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩১

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মহান চিত্রশিল্পী যামিনী রায় ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৩

রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ দেখে এলাম
◻ ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৫

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের ক্রমিক ইতিহাস
◻ রাকেশ দাশ ◻ ৩৭

হিমালয়ের মতো উন্নত ব্যক্তিত্ব রঙ্গা হরিজী
◻ ড. মনমোহন বৈদ্য ◻ ৪৩

এক কর্মযোগীর স্মৃতিচারণ ◻ দিবাকর ঘোষ ◻ ৪৬

হর হর মোদী ঘর ঘর মোদী ◻ ড. রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

ফ ঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রকাশিত হবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গীতাই মানবজাতির জীবনদর্শন

গীতাকে বলা হয় মানবজাতির জীবনদর্শন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থ মানবজাতি ভারতবর্ষের থেকে পেয়েছে। মানবজাতি জীবনের দিক্‌নির্দেশনা প্রাপ্ত হয় এই মহাগ্রন্থ থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, গীতা জীবন সংগ্রামের এক অপূর্ব পাথেয়। শ্রী অরবিন্দ গীতাকে 'দ্য ডিভাইন টিচার' বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষের মধ্যে গীতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও গীতাপাঠের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে সারা বিশ্বে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় গীতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. রাকেশ দাস, ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উন্নত ভারত

একদা স্বর্ণভূমি ছিল ভারতবর্ষ। বিদেশিরা এই ভূমিকে 'সোনে কী চিড়িয়া' বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারই লোভে বিদেশি দস্যুরা বারবার হানা দিয়াছে এই দেশে। এই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু বারবার লুণ্ঠন করিয়াও তাহারা এই দেশকে নিঃস্ব করিতে পারে নাই। দেশের বীর সন্তানরা আপন পৌরুষবলে পুনরায় ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। এক সময় আসিয়াছে ইংরাজ। তাহারা লুণ্ঠন, শোষণ ও অত্যাচার করিয়া দেশকে আর্থিকভাবে দুর্বল করিয়াছে। এত লুণ্ঠন করিয়াছিল যে দেশকে বহুবার মন্বন্তরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অন্নাভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হইয়াছে। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা দীর্ঘ কয়েক দশকেও দেশের মানুষের দুর্গতি ঘোচাইতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। দেশকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করিবার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা তাহাদের ছিল না। বরং তাহারাও বৈদেশিক লুঠেরার ন্যায় দীর্ঘ সময় ধরিয়া দেশকে লুণ্ঠন করিয়াছে। সদ্য স্বাধীন ভারতে জিপ কেলেঙ্কারির কথা প্রবীণদের অদ্যাবধি স্মরণে রহিয়াছে। তাহার পরও প্রায় সত্তর বৎসর তাহারা সরকারে রহিয়া ক্রমাগত দেশকে লুণ্ঠন করিয়াছে। ফলস্বরূপ, সর্বদিক দিয়া দেশ দুর্বল হইয়াছে। এমতাবস্থায় ২০১৪ সালে দেশবাসী প্রকৃত দেশভক্ত দলের নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছে। দেশের প্রধান সেবকরূপে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিকাশকল্পে নানাবিধ যোজনা গ্রহণ করিয়া তাহা বাস্তবায়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দফায় দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া আরও বহুবিধ যোজনা গ্রহণ করিয়া দেশের বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। দেশের আর্থিক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করিয়া দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত পুনরুত্থিত শক্তিরূপে তাহার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে সপ্তদশ শতাব্দী অবধি ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত ছিল। রাজনৈতিক পরাধীনতার কারণে সেই গরিমা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান মোদী সরকার সমগ্র ক্ষেত্রে সর্ববিধ প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে যাহাতে ভারত তাহার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে। তাহার জন্য সরকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রসারে নানাবিধ যোজনা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ করের সংস্কার এবং সহজে আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ। ইহার ফলেই সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিতেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরাও ভারতে বিনিযোগের জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন। সামরিক ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে দেশ আত্মনির্ভর হইয়াছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিরক্ষা রপ্তানিও বহু হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক পরিবহণ, রেল ও সীমান্ত উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়াছে। মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ এবং যুবপ্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়াছে।

শুধুমাত্র সততা, সদিচ্ছা এবং নিশ্চিত পরিকল্পনার দ্বারা ভারত সরকার চার লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি অতিক্রম করিয়াছে, ইহা কম কথা নহে। নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের পক্ষে ইহা এক মাইল ফলক। বিশ্ব ব্যাংকের নথিতেও উল্লেখ করা হইয়াছে, মোদী সরকারের শাসনকালে গত এক দশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ওই নথিতে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে, ভারত পাঁচ বৎসরে যাহা অর্জন করিয়াছে, অন্য যে কোনো দেশের পক্ষে তাহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিবার কথা। বিশ্ব ব্যাংকও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনার প্রশংসা করিয়াছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং জিডিপি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপাইয়া যাইবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারও এই অভিমতকে সমর্থন করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে, ভারতের সামগ্রিক বৃদ্ধি বলিতে রাজ্যগুলির বৃদ্ধির সমষ্টিকে বোঝায়। মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের যোগদান কোথায়? দেশের অগ্রগতি ঘটিতেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ হইল বৈদেশিক লুঠেরার ন্যায় রাজ্যের রক্ষকই ভক্ষকে পরিণত হইয়াছে। তাহারাই এই রাজ্যকে লুণ্ঠন করিতেছে। লুণ্ঠন বন্ধ না হইলে উন্নত ভারতের স্বাদ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মিলিবে না।

সুভাষিতম্

সতাং হি দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাশ্চ সজ্জনাঃ।
কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সজ্জনসঙ্গতিঃ।।

সৎ ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রই পুণ্য লাভ হয়। কেনন সৎ ব্যক্তি তীর্থস্বরূপা। বলা হয়ে থাকে, তীর্থদর্শনের ফল সময় এলে পাওয়া যায় কিন্তু সৎসঙ্গের ফল শীঘ্র পাওয়া যায়।

নজরে 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত আর মমতা মুক্ত রাজ্য' রাজ্যে অভিনব পরিস্থিতি তাই 'কর্তব্য' ঈশ্বর কণ্ঠ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

চার রাজ্যের নির্বাচনের তিনটিতে বিজেপির অভাবনীয় জয়ে সারা দেশে নতুন করে কংগ্রেস মুক্ত ভারতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে। তিন রাজ্যে বিজেপির জয় এই রাজ্যের শাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে নতুন করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করবে। মমতা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গের লড়াইয়ে এতটা অক্সিজেন বিজেপি আগে কখনও পায়নি। মমতার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেবে তার দলের আরও কয়েকজন নেতার গ্রেপ্তারি। সে তালিকায় সম্প্রতি উপরের দিকে নাম জুড়েছে ফিরহাদ হাকিম (ববি), মলয় ঘটক আর অবশ্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা সকলেই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। বাকি শুধু প্রমাণের অপেক্ষা। তবে বিজেপি বিরোধী সদ্যোজাত ইন্ডিজোটের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার সবার মতো মমতাও তা বুঝতে পারছেন। যে গেরুয়া ঝড় ভারতের প্রতিটি কোনায় পৌঁছে গিয়েছে তা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে বাদ পড়বে না তা সহজেই বলা যেতে পারে। সে ঝড়ের প্রধান শিকার যে মমতাই হবেন তা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যদি কোনো অঘটন না ঘটে যায়। তবে সেরকম কোনো বার্তা আমার কাছে নেই।

ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই রাজ্যে লোকসভা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে গিয়েছেন। লোকসভা লড়াইয়ের এক অভিনব আর অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাহ। বুঝিয়েছেন লোকসভা ভোটে লড়াই কেন আর কীভাবে কেবল প্রধানমন্ত্রিত্বের লড়াই। তাই রাজ্য বিজেপি কর্মীদের কাছে তিনি নিদান হেঁকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন লড়াই করুন যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলতে বাধ্য হন যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পুনরায় তিনি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। শাহ কথাটা এমন একটা রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বলেছেন যখন লোকসভা ভোটের ৩-৪ মাস বাকি। ভাইপো সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খানিকটা পিছনে ঠেলে দিয়ে মমতা আবার রাজ্য রাজনীতির রশি নিজের হাতে নিয়েছেন। কানাঘুষো চলছে চলতি মাসের ভিতর আদালতের নির্দেশে ইডি-সিবিআইয়ের হাতে অভিষেকের রশি আটক প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আর তাতে মমতা তাকে আড়ালে সরিয়ে দিয়েছেন। আর অভিষেক বিরোধীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। অভিষেককে ঢেকে রাখা মমতার উদ্দেশ্য।

> **গেরুয়া ঝড় ভারতের প্রতিটি কোনায় পৌঁছে গিয়েছে, তা থেকে বাঁচেনি পশ্চিমবঙ্গও। সে ঝড়ের প্রধান শিকার যে মমতাই হবেন তা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।**

শাহের এই জোরালো নিদানে রাজ্যের বিজেপি কর্মীদের মনোবল বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব। দেশের এক নম্বর সর্বভারতীয় দল হিসেবে বিজেপিকে প্রায় প্রতিদিন নতুন ভাবনা আর চিন্তার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। মমতার কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। দুর্নীতির পাঁকে আটকে গিয়ে মমতার এখন হিমশিম অবস্থা। ইদানীংকালের মধ্যে অমিত শাহর চিন্তায় যে ধরনের নতুন ভাবনা দেখা দিয়েছে তা অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে শোনা যায়নি। শোনার কথাও নয়। কারণ জাতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির সমান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কংগ্রেসের ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। কংগ্রেস মনে করছিল কয়েকটা রাজ্য দখল করেই মর্যাদা রক্ষা করবে। বিজেপির দুরন্ত জয় কংগ্রেসের সে নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রাজ্যে শাসন কায়েম করেও দিল্লি কংগ্রেসের নাগালের বাইরে ছিল।

রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতা ২০১৯ বা ২০২১-এর তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে বলে দাবি করছেন তাদের রাজ্য নেতৃত্ব। দাবিটা সঠিক, কারণ মমতা বিজেপিকেই পাখির চোখ বানিয়েছেন। বাকি বিরোধীরা 'দুধ ভাত'। এই রাজ্যে দুর্নীতি বিরোধী ফাঁস কঠিন হচ্ছে। রাজ্য বিজেপির সংগঠন তাতে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বিজেপির বিশাল জয় সে রশিতে ভালো করে মোম লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে জুড়েছে অমিত শাহর উৎসাহ। এই জোড়া ফাঁস থেকে মমতার বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই কর্তব্য পালনই হলো এখন ঈশ্বর কণ্ঠ। ◻

মোদী কী গ্যারান্টি, দিদি হ্যায় ঘমন্ডি

অহংকারপ্রিয়েষু দিদি,

হ্যাঁ, দিদি, আপনার অহংকার আছে। থাকবেই-বা না কেন? আপনি ক্ষমতায় আসার হ্যাট্রিক করেছেন। একলা লড়াই করে। নিজে নন্দীগ্রামে হেরেছেন তবু আপনি অহংকার ছাড়েননি। ভারতে উপনির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হওয়ার নজির তৈরি করেছেন আপনি। এও কী কম অহংকারের কথা। তাই, একের পর এক মন্ত্রী জেলে গেলেও, রাজ্যে শিল্প না এলেও আপনার অহংকার যায় না। আপনি বিশ্বের সব ভাষা জানেন, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বাণী লিখতে জানেন, হিজিবিজি কাটতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন। ফুটবল, ক্রিকেটও নাকি! আপনার অহংকার থাকবে না তো কার?

যদিও আপনার অহংকার ফুটো হয়ে গিয়েছিল গত লোকসভা নির্বাচনের পরে। অনেক ঘণ্টা চুপ করে থেকে বলেছিলেন, দুধেল গাইয়ের লাথি খাবেন। কিন্তু এবার সত্যই দুধেল গাইরাও লাথি মারবে না তো! কেন বলছি জানেন? কারণ, আপনি জয়ের অঙ্ক জানেন। কারণ, এটা সত্য যে নন্দীগ্রামে এবং আদালতে বার বার হারলেও অনেক জয়ও আপনি দেখেছেন।

কিন্তু দিদি, সব জয় এক নয়। কিছু কিছু জয়ের মধ্যে একটা মারাত্মক বার্তা থাকে। সদ্য শেষ হওয়া চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে তিনটি রাজ্যে বিজেপির জয়ের মধ্যে তেমনই একটি বার্তা রয়েছে। শুধু জয় নয়, এগুলি 'বিজয়'। বিপুল জয়ে কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করার পরে এটাই বাস্তব যে, বিজেপি এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে— নির্বিকল্প। কোনও বিকল্প ধারে কাছে নেই। কংগ্রেস-সহ বাকিদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে। আরও একটা কথা হলো, বিজেপির এই তুমুল বিজয় প্রথমত এবং প্রধানত নয়, একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর কৃতিত্ব। যে কৃতিত্বের নাম 'মোদী কী গ্যারান্টি'।

কোনও বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নিয়ে রাজ্যেই লড়েনি। সর্বত্রই মানুষ মোদীকে দেখে দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে। এই রণকৌশলে কিন্তু বড়ো ঝুঁকি ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই ঝুঁকি নিয়েই সফল হয়েছেন। সাড়ে ন' বছর ক্ষমতায় থাকার পরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির কাছেই এই সাফল্য একটি মহাকায় স্বস্তিচিহ্ন। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া নেই। ভোটকে যদি সত্যিই যুদ্ধ হিসেবে দেখতে হয়, তা হলে বিজেপির মোদীকে মুখ করার রণকৌশল এই মুহূর্তে সংশয়াতীত।

হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন যে, একটি রাজ্যে তো কংগ্রেস জয়ী। কিন্তু দিদি, উত্তর ভারত যার, দিল্লি তার। এটাই তো প্রমাণিত প্রবাদ। তেলেঙ্গানা কিন্তু উত্তর ভারতের বাইরে। তবে, সেখানেও মোদীমন্ত্রকে ব্যর্থ বলা যাবে না। কারণ, সে রাজ্যেও বিজেপির আসন বেড়েছে। ফলে দেশের বিন্ধ্য-উত্তর বলয়ের বাস্তবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের এই বহু-আলোচিত ফারাকটি আর কতদিন থাকবে তা নিয়েও চিন্তা রয়েছে।

> কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া নেই। ভোটকে যদি সত্যিই যুদ্ধ হিসেবে দেখতে হয়, তা হলে বিজেপির মোদীকে মুখ করার রণকৌশল এই মুহূর্তে সংশয়াতীত।

তবে দিদি, তেলেঙ্গানা কংগ্রেস জিতলেও লোকসভা ভোটের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। কারণ, সে ভোট হবে রাজ্য নয়, কেন্দ্রের কাজ দেখে। মানুষ অন্য মত জানাতে পারে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণের আসনসংখ্যা উত্তরের তুলনায় অনেকটা কম। আর এখন বিজেপি যে ৩০৩ আসন নিয়ে লোকসভায় তা দক্ষিণের উপরে নির্ভরশীল নয়। সুতরাং, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের সাফল্য মোদীর তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে কোনও অস্বস্তির সূচক নয়।

এই ফলাফল কিন্তু দিদি আপনার স্বপ্নের 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে হিমালয়সমান প্রশ্ন তুলে দিল। অবশ্য জোট কি আদৌ রয়েছে! যা যা সব পরিকল্পনা আর আপনার সঙ্গীদের যা চরিত্র তাতে জোট হওয়াই সম্ভব নয়। মাঝে মধ্যে সবাই মিলে বসে চা খাওয়া, ডিনার করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় হবে না। আর এই সব দেখে আরও বেশি করে মানুষ নিশ্চিত বিজেপিকে সমর্থন দেবে।

এবার আসি আমাদের রাজ্যের কথায়। গত ২৯ নভেম্বর অমিত শাহের সভায় যে ভিড় হয়েছিল তা আপনি ঘরে বসে দেখেছেন। আগামী ২৪ ডিসেম্বর মোদী আসছেন। ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ হবে। তবে যা শুনছি তাতে গোটা রাজ্য জুড়ে সেদিন কোটি কণ্ঠে গীতা পাঠ হবে। তার পরে ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। গোটা দেশে রামের নামে জয়ধ্বনি শোনা যাবে। সঙ্গে কিন্তু মোদীর নামেও। কারণ, তিনি যা বলেছিলেন তা করে দেখিয়েছেন। তারপরে আপনাদের ২২ আসন ধরে রাখতে পারবেন তো! চিন্তা হচ্ছে দিদি। ভয়ও হচ্ছে।

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম

কর ব্যবস্থায় সুচিন্তিত সংস্কারের কারণে রাজস্ব আদায়ের রেকর্ড

কর ও জিডিপির আনুপাতিক হার হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিমাপ যা গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি ভালো খবর। সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত ট্যাক্স কোডের সরলীকরণ করা এবং স্বনির্ভর পেশাদারদের আয়কে করের আওতায় আনতে একটি কর পদ্ধতি চালু করা। প্রত্যেক মাসেই আমরা পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) রেকর্ড পরিমাণ আদায়ের কথা জানতে পারছি। প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিচক্ষণ নীতির ফলেই ভারতীয় কর ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক অনুশাসনের কিছু মাপকাঠি রয়েছে যা কর ও জিডিপির আনুপাতিক হারের মতো গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র পরিসংখ্যান হিসেবে নয়, এর মাধ্যমে দেশের আর্থিক অবস্থা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও জনসেবায় ব্যয় করার সামর্থ্যেরও প্রতিফলন ঘটে।

ভারতে বিগত কয়েক দশকে কর সংগ্রহের ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। ২০০৮ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করে উভয় ক্ষেত্রে 'কর ও জিডিপির আনুপাতিক হার' ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে, ২০১৬ সাল পর্যন্ত আর্থিক নীতি ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে আর্থিক ক্ষতির জন্য দেশের আর্থিক অবস্থা স্পষ্টতই পিছিয়ে পড়া অবস্থায় ছিল, যেখানে ভারত পাঁচটি ভঙ্গুর অর্থনীতির একটি অংশ ছিল। তবে, বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক সংস্কারের ফলে সেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং তার ফলে দেশের কর সংগ্রহ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। অর্থনৈতিক গতি আরও শক্তিশালী হয়েছে। ২০১৬ সালের পর থেকে কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায়ের দ্রুত বৃদ্ধির প্রতিফলন দেখা গেছে। শতাব্দীর অন্যতম মহামারীর কারণে কয়েক বছর কর সংগ্রহ কম থাকার পর পুনরায় কোভিডের আগের মতোই কর সংগ্রহ গতিশীল হয়েছে।

প্রত্যক্ষ করের মধ্যে রয়েছে আয়কর ও কর্পোরেট ট্যাক্স। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রত্যক্ষ কর ও জিডিপির আনুপাতিক হার ধারবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, ৬ শতাংশ কমেছে ২০০৮ সালে এবং ৫৫ শতাংশ কমেছে ২০১৬ সালে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে কর কাঠামো সরলীকরণ, ডিজিটালাইজেশনের প্রসার ও করের আওতা বৃদ্ধি, যার ফলে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর্পোরেট ট্যাক্সের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ কর ও জিডিপির আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্যভাবে ৬ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়া অর্থনীতিতে Laffer Curve তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার থেকে বোঝা যায়, সর্বোত্তম ট্যাক্স হারের মাধ্যমে কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ সর্বাধিক করা যায়। যেহেতু ২০১৯ সালের আগে কর্পোরেট ট্যাক্সের হার অনেকটাই বেশি থাকায় কর্পোরেট ট্যাক্সের হার কম করা একটা ভালো উদ্যোগ যা আর্থিক বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে উৎসাহবর্ধক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে করের হার কম করলে ব্যবসা যেমন লাভবান হয়, সেরকম অর্থনীতিও লাভবান হয় এবং প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ কর নীতির পরিবর্তনে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কর কাঠামো পরিবর্তনে অর্থনৈতিক পরিসর যেমন বৃদ্ধি পায়, আর্থিক গতিও বেশি শক্তিশালী হয়। পণ্য ও পরিষেবা (জিএসটি) কর অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কর ও জিডিপির আনুপাতিক হারেও একই রকম চিত্র দেখা যায়। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত এ ক্ষেত্রেও মন্দা ছিল। জিএসটি লাগু হওয়ায় কার্যকরী করের হার অনেকটাই কম

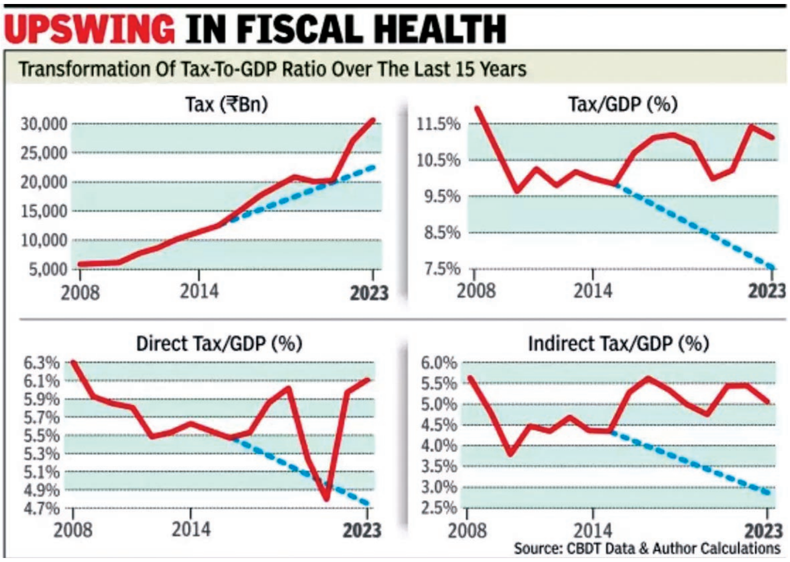

কারণ পৃথক পৃথক কর ব্যবস্থা লাগু থাকলে বাস্তবে প্রকৃত করের হার অনেক বেশি পড়ে যা অর্থনীতির Laffer Curve তত্ত্বের সঙ্গে সমানভাবে মিল খায়।

বর্তমান সরকার কিছু কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে কর প্রদানের আওতা বৃদ্ধি করেছে যেমন 'বিবাদ নয় বিশ্বাস' এবং 'মুখবিহীন মূল্যায়ন' (Faceless Assessment)-এর মাধ্যমে আয়কর ব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলেছে। কর ফাঁকি রুখতে ও কর জালিয়াতি ধরতে ডাটা অ্যানালিটিক্স (data analytics) ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কর প্রদান সুনিশ্চিত হয়। এছাড়া কর সংগ্রহের পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমেছে। নীতিগত ভাবে বেশ কয়েকটি আয়কর আইনেরও সংস্কার হয়েছে।

প্রথমত, ১৯৬১ সালের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট বারবার সংশোধনের ফলে আগোছালো টুকরো টুকরো বিশাল আকারের আয়কর আইন সহজ হয়েছে। এই আইনটি বর্তমানে তাদের কাছে স্বপ্নের ময়দান, যারা কর ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যতাকে দূর করে সৎ ব্যক্তিদের জন্য আরও বেশি করবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হতে পারে। প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার (Direct Tax Code) পুনর্লিখনের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তার আমিও একজন সদস্য ছিলাম এবং সেই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল যে আয়কর আইন, ১৯৬১-এর পরিবর্তে অবশ্যই ক্ষুদ্রতর আকারে অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আয়কর আইন হওয়া উচিত। প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেটে জোড়াতালি দেওয়ার প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, কর ব্যবস্থায় দুধেল গাইয়ের মতো বেতনভোগী কর্মচারীদের বাইরেও ট্যাক্সের এরিয়া বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কর বিভাগের গবেষণায় দেখা গেছে, স্বনির্ভর পেশাদার, যেমন— আইনজীবী, ডাক্তার, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও সম্পত্তির মালিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দিয়ে থাকে।

ক্রমান্বয়ে কম বেতনভুক্ত সৎ কর্মচারীদের করের বোঝা কম করতে তথ্য বিশ্লেষণের (Data analytics) মাধ্যমে স্বনির্ভর পেশাদার ও সম্পত্তির মালিকদের উপর কর বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে কর ও জিডিপির আনুপাতিক হার কমার পরিবর্তে বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেছে যা কর ব্যবস্থায় সুচিন্তিত নীতিগত সংস্কারের কার্যকারিতার প্রতিফলন। এছাড়াও কর সংগ্রহে আরও অগ্রগতি হলে জরুরি পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে এবং অত্যাবশ্যক জনসেবায় খরচ করতে দেশ সমর্থ হবে।

(লেখক আইএমএফ-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চলে গেলেন কামারপুকুরের মা

গত ৩০ নভেম্বর নিজ গৃহেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কামারপুকুরের মা। স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা এই নামেই তাঁকে চিনতেন। তিনি স্বামী অসীমানন্দজীর মাতৃদেবী প্রমীলা সরকার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় বেশ কিছু সময় ধরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বামী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ সরকার। তিনি সাতপুত্রের জননী। অসীমানন্দজী দ্বিতীয়। জ্যেষ্ঠ সুকুমার সরকার-সহ সকলেই স্বয়ংসেবক। পুরো পরিবার সঙ্ঘময়। বাড়িতে স্বয়ংসেবকদের যাতায়াত লেগেই থাকে। সহস্র চন্দ্র দর্শনের জন্য কুটুম্ব প্রবোধনীর পক্ষ থেকে মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। গত বছর মায়ের জন্মদিন হরিসংকীর্তনের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। সেই ১৯৭১ সাল থেকে আজ ২০২৩ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের তিনি আদর আপ্যায়ন করে এসেছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, অতবড়ো পরিবার সামলে কীভাবে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের কাছে 'কামারপুকুরের মা' হয়ে উঠেছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীরাই তা জানেন। শ্রী ভগবান মা-কে তাঁর চরণে স্থান দেন—এই প্রার্থনা।

* * *

মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সূর্যদেব ঝা গত ২৭ নভেম্বর বেঙ্গালুরু শহরে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি হন এবং পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি দঃপূঃ রেলওয়ে থেকে সিনিয়র টি টি ই হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এক সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছু সময় ভারতীয় জনতা পার্টির নগর সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৩ সালে একাত্মতা রথযাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। হিন্দি সাহিত্যের কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ছোটোপুত্র রাজকুমার ঝা সমাজ সেবা ভারতীর প্রান্ত সমিতির সদস্য।

চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল যা শিক্ষা দিয়ে গেল

প্রথম সারির দু'একটি সংবাদমাধ্যম বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমই যে রাজ্যের শাসকদলের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে, ফের একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সদ্যসমাপ্ত চার রাজ্যের নির্বাচনের একজিট পোলের হিসেবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের একাংশ রটিয়েছিল, জনা কুড়ি বিজেপি বিধায়ক নাকি রাজ্যের শাসক দলে যোগ দেওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন, শুধু চার রাজ্যে ফল ঘোষণার অপেক্ষা! অনেকেই চার রাজ্যে জয়ের পর রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের উচ্ছ্বাস, আক্রমণাত্মক মেজাজ দেখে বলছেন, দিল্লির ভরসায় আর কতদিন? সর্বভারতীয় পার্টি তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করবে, এটাই স্বাভাবিক। এই যুক্তিকে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, শুরুটা করেছিল সেই সংবাদমাধ্যমই যারা রটিয়ে দিয়েছিল চার রাজ্যে বিজেপির খারাপ ফল হলে এরাজ্যে বিজেপির হালও নাকি খারাপ হবে। এমনকী বিরোধী দলের মর্যাদাও খোয়াতে হতে পারে। এই নির্লজ্জ তাঁবেদারির বাস্তবিক ফল আজ দেখা যাচ্ছে।

বস্তুত, এই শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমগুলি একজিট পোলের ভিত্তিতে অত্যুৎসাহী হয়ে ধরেই নিয়েছিল, চার রাজ্যে বিজেপি খারাপ ফল করবে, সেইসূত্রে ২০২৪-এও লোকসভায় হারবে ইত্যাদি। সুতরাং নানা রটনা, অপপ্রচার চালিয়ে এরা রাজ্য-রাজনীতিকে অকারণে উত্তপ্ত করার বাতাবরণ তৈরি করে দিচ্ছিল। তার ওপরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে বিধানসভায় কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার জন্যে একপ্রকার গায়েরজোরে দু'বছরে দু'দুবার সাসপেন্ড করা হলো তাঁকে। সবমিলিয়ে যা হলো, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের যে ভূমিকা দেখা গেল, তাতে বলাই যায় এরাজ্যে মোটেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত নয়।

চার রাজ্যের নির্বাচনে ইতিবাচক দিক কোনটি? প্রথমত, অ্যান্টি ইনকামবেন্সির তত্ত্বকে উড়িয়ে মধ্যপ্রদেশে বিপুল জয়। মোদীর ভাষায়, মানুষের জন্য ভালো কাজ করলে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি কোনো ফ্যাক্টর নয়। দ্বিতীয়ত, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্য পুনরুদ্ধার। এই দুটি রাজ্যে কংগ্রেসি-শাসন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গের যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তা সারা ভারতের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ালে তৃতীয়বারের জন্যও মোদীর নিরঙ্কুশ জয় আগামীবছর কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই আশঙ্কা শুধু কংগ্রেস নয়, সামগ্রিকভাবে বিরোধীদের, স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ইন্ডিয়া জোটকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তৃতীয়ত, তেলেঙ্গানাতেও আশাতীত সাফল্যের ব্যাপার বলতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রথম সারির টিভি চ্যানেল বিজেপির চার রাজ্যে জয়ের ইঙ্গিতে ক্যাপশন করেছিল, 'হিন্দি বলয়ে বিজেপির সাফল্য'। এটা এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের পুরোনো রোগ। 'হিন্দি- বলয়', 'গো-বলয়' ইত্যাদি নাম দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে যথাসম্ভব বাকি ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

> **চার রাজ্যের নির্বাচনে যেমন তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, তেমনি প্রমাণ করে দিল জনপ্রিয়তার নিরিখে আজও মোদীর ধারেকাছে কেউ নেই।**

চার রাজ্যে নির্বাচন ইন্ডিয়া জোটেও ফাটল তৈরি করে দেবে। মনে রাখতে হবে, এই জোটের ভিত্তি কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নয়, বরং আর্থিক কেলেঙ্কারি। যাদেরই বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে, তারাই পিঠ বাঁচাতে ইন্ডিয়া জোটে ভিড় করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। যাতে ভয় পেয়ে কেন্দ্র দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ করে দেয়। এই নির্বাচনে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, চার রাজ্যের নির্বাচনেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গিয়েছিল এবং তাতে সাফল্যও লাভ করেছে।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করলে বোঝা যাবে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি যে কোনো রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে শাসক দলের কাছে বিশেষ সম্পদ বলে পরিগণিত হওয়ার কথা এবং সেটা তো গৌরবেরই কথা, তা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু আজ এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে বিরোধীরা ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান হারিয়েছে। গোটা বিশ্বের দরবারে ভারত যাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, তাঁকেই অমূলক আক্রমণ করে বিরোধীরা হাসির খোরাক হচ্ছে, চার রাজ্যের নির্বাচনে যেমন তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, তেমনি প্রমাণ করে দিল জনপ্রিয়তার নিরিখে আজও মোদীর ধারেকাছে কেউ নেই। এই দেওয়াল লিখন যত তাড়াতাড়ি বিরোধীরা পড়তে পারবে ততই দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল। □

পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির পরিকল্পনা

২০০৫ সালের ১২ জুলাই ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, অনুপ্রবেশ প্রকৃতপক্ষে ভারতভূমি দখলের জন্য বহিরাগতদের একটি নিঃশব্দ আক্রমণ— এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন। এখনই প্রতিরোধ করা না হলে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূলের এক নেত্রী বলেছেন, রাজ্যে থাকা বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। আর ভোটার তালিকায় নাম তুলতে যদি তাঁদের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের শরণাপন্ন হতে হবে।

বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হাবড়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাস বলেছেন, তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জাকির হোসেন ভোটার কার্ড তৈরি করার লিঙ্ক সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। ওই অনুষ্ঠানে জাকির উপস্থিত ছিলেন। রত্না বিশ্বাস আরও বলেন, আর বাকি তিন মাস। তিন মাস বাদেই আমাদের লড়াই লড়তে হবে। এখন ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ চলছে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বাস করেন। জাকিরদা, অভিজিৎদা (স্থানীয় তৃণমূল নেতা) লিঙ্কটা ভালো জানেন। যদি লিঙ্কের কোনও সমস্যা হয়, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন ভোটার লিস্টে নাম তোলার ক্ষেত্রে যদি সমস্যায় পড়েন, জাকিরদার কাছে গেলে ভালো করে বলে দেবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। আমরা চাই না, একটা ভোটও বাদ যাক। এ থেকে এটা প্রমাণ হলো যে তৃণমূলকে জেতাতে ওপারের মুসলমানরাও ভোট দিয়ে থাকে।

যথারীতি বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে লোকসভা নির্বাচনে জেতার ছক কষছে তৃণমূল। স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। আর একেরপর এক নেতা-নেত্রী সাফাই গাইতে শুরু করেছেন।

এ বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'সামান্য ভোটের জন্য দেশের সুরক্ষা শৃঙ্খলাকে বিপদে ফেলে বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'বেআইনি কারবার করার জন্য তৃণমূল গুছিয়ে বসে আছে। শুধু টাকাটা পেলেই হলো।'

রত্না বিশ্বাসরা ভুলে গেছেন যে বর্তমান বাংলাদেশকে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা এদেশে এসে রাজ্যের প্রতিটি জেলাসদরে অবস্থিত 'রেজিস্টারিং অথরিটির' দপ্তর থেকে নাগরিকত্ব শংসাপত্র পেতেন আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইনের বলে। তাতে বলা আছে— '...a person should be registered as a citizen of India under the Provisions of Section 5 (1) (a)/(d) of the Cittizenship Act, 1955.' রত্না বিশ্বাসদের আরও জানা প্রয়োজন যে ১৯৭২ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বীকৃতি পেলে সেদেশ থেকে আসা লোকেদের জন্য আগের নাগরিকত্ব আইন বাতিল হয়ে যায়।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে শুধুমাত্র হিন্দুরাই এসেছে, কোনো মুসলমান আসেনি। বরং সেই সময় দুই দেশের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সঙ্গে জমিজমা, সম্পত্তি বিনিময় প্রথার সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন এবং ওদেশ থেকে হিন্দুরা এসেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কয়েক কোটি হিন্দু-মুসলমান ওদেশ থেকে এসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয় এবং দেশ স্বাধীন হলে তারা সবাই তাদের দেশে ফিরেও যায়। কিন্তু এদেশে থাকার সময় তারা এরাজ্যের যোগাযোগ, ব্যবসাবাণিজ্য, জনসাধারণের সমৃদ্ধি দেখে আকৃষ্ট হয়। সেই সময় তাদের দেশে না খেয়ে মরার অবস্থা। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ১৯৮০ সালের দিক থেকে কিছু কিছু মুসলমান এ রাজ্যে আসা শুরু করলে সিপিএমের নেতারা তাদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড প্রভৃতি সরকারি নথিপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ফলে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মুসলমানরা এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এদেরকেই বলা হয় অনুপ্রবেশকারী। এই অনুপ্রবেশকারীরাই যেমন একদিকে বামফ্রন্টের 'সম্পদ' ছিল

ফঃ ২

তেমনি এখন তারা তৃণমূলের 'দুধেল গাই' হিসেবে সম্মানিত।

তৃণমূলিরা বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী তথা হিন্দুদের প্রতি কোনোদিনই দরদ দেখায়নি। যদি দরদ দেখাত তাহলে সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধন বিল পাশ হওয়ার প্রতিবাদে সরকারের সমর্থন ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠানের ওপর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা হামলা করতে পারত না। রত্না বিশ্বাস তৃণমূলের মনের গোপন কথাটাই বলে ফেলেছেন। কথাটা বলার পর যখন বুঝতে পেরেছেন, এটি দেশবিরোধী কথা হয়েছে, তাই তাঁরা সবাই মিলে সাফাই গাওয়া শুরু করেছেন।

এটা তো ঠিক বামফ্রন্টের ৩৪ বছর শাসনে এবং তৃণমূলের ১২ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশারীদের জামাই আদরে ডেকে আনা হয়েছে এবং এখনও আনা হচ্ছে, তার ওপর তাদের পরমাত্মীয়ের মতো আগলে রাখা হচ্ছে। তার প্রতিফলন তো আমরা দেখেছি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অপরাধমূলক কাজকর্মের পরিসংখ্যানেই তা জানা যাচ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই যে সমস্ত অসামাজিক কাজ যেমন— খুন, জখম, ছিনতাই, বাটপাড়ি, পকেটমারি, রাহাজানি, হল্লাবাজি, তোলাবাজি, অপহরণ, মেয়ে পাচার, চোরাচালান, হিন্দুদের শোভাযাত্রায়, উৎসবে হামলা ইত্যাদি সহ রাষ্ট্রদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ঘটনা ঘটছে তার প্রতিটির সঙ্গে জড়িত দেখা যায় এসব অনুপ্রবেশকারীদের ও তাদের স্বধর্মাবলম্বী স্থানীয়দের। ইসলামি বাংলাদেশে যে সমস্ত অপকর্ম করে তারা পার পেত না, সেসব অপকর্ম এদেশে এসে তারা নির্বিবাদে হাসিল করছে। এদেশের আইন আদালত ও সরকারি প্রশাসন তাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করছে। আর তার সঙ্গে এবার প্রকাশ্য সভায় শাসক দলের নেত্রী দেশবিরোধী কাজ করার নির্দেশও দিলেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজ মুখেই বলেছেন, ওবিসি'র নিরানব্বই শতাংশ সংরক্ষণ শুধু মুসলমানদেরই দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ও অসম এই দুরভিসন্ধি রুখে দিতে পেরেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা! ৫০০-১০০০ টাকা ভিক্ষা নেওয়া হিন্দুরা কী এখনও ঘুমিয়ে থাকবে?

১৯৯৬ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান টিভি রাজেশ্বর রাও ভারত সরকারকে দেওয়া গোপন রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, 'বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এবং অসমের পাঁচটি জেলায় গোপনে প্রবেশ করে ঘাঁটি গেড়েছে। ওঁদের লক্ষ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর ইসলামি বাংলাদেশ গঠন করা। এই ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের ইসলামি সংগঠনগুলি এবং পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়েরও সক্রিয় মদত রয়েছে।' কিন্তু তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার এই রিপোর্টটিকে আমল না দিয়ে ধামাচাপা দিয়েছে। বর্তমানে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

২০০5 সালের ১২ জুলাই ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, অনুপ্রবেশ প্রকৃতপক্ষে ভারতভূমি দখলের জন্য বহিরাগতদের একটি নিঃশব্দ আক্রমণ— এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন। এখনই প্রতিরোধ করা না হলে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

তারপর ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দ্বিতীয়বার তদানীন্তন ইউপিএ সরকারকে সতর্ক করে বলেছিল যে, বাংলাদেশ থেকে কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হোক। কিন্তু মনমোহন সিংহ সরকার সর্বোচ্চ আদালতের এই আদেশকে গুরুত্ব না দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাংকের জন্য নীরব থেকেছে।

এসব কারণে বলতেই হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের শিয়রে এখন ভীষণ বিপদ। প্রকাশ্যে ঘোষণা, অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড দেবে তৃণমূল। সবাই দেখেছে, তৃণমূলের প্রচারে বাংলাদেশি অভিনেতা, তৃণমূলের পুজায় বাংলাদেশি অভিনেতা, বাংলাদেশি ক্রিকেটার, তৃণমূলের প্রার্থী বাংলাদেশি ভোটার, তৃণমূল নেত্রীর মুখে বাংলাদেশের স্লোগান 'জয় বাংলা'। বৃহত্তর ইসলামি বাংলাদেশ তৈরির পরিকল্পনা করছে তৃণমূল। তাই তো সিএএ-এর বিরোধিতা, এন আর সি'র বিরোধিতা।

এত কিছু কাণ্ড দেখে রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কি এখনও চোখ বুজে থাকবে? দেশদ্রোহীদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না? কেন্দ্র সরকার যদি দেশদ্রোহীদের উপেক্ষা করে চলে এবং পশ্চিমবঙ্গ যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। যা কখনোই কাম্য নয়। তাই দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য যে কোনো কঠিন ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে এবং দেশ থেকে সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াতেই হবে। নচেৎ আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদল না হলে খুব তাড়াতাড়ি তা বাস্তবায়িত হবে। সময় কিন্তু বেশি নেই। ◻

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ক্রিকেটে ভারতের হারে বাংলাদেশের উল্লাস কেন?

গৌতম কুমার মণ্ডল

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজের মনে ভারত বিদ্বেষ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। এই বিদ্বেষের বীজ যে প্রায় বিষবৃক্ষ হয়ে উঠেছে তা বোঝা গেল সদ্য সমাপ্ত ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলাকে কেন্দ্র করে। খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি; কিন্তু ভারতের হারে সে দেশের যুবসমাজ বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে নানাভাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল ও ভারতকে আক্রমণ করে গেছে। এইসব আক্রমণ যেমন ঘৃণ্য তেমনি তাদের হীন মানসিকতার পরিচায়ক। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ যে কতখানি বাড়ছে তা সামগ্রিক মাধ্যমের কন্টেন্টস ও কমেন্টসগুলি দেখলেই বোঝা যায়। যেদিন ভারত ফাইনাল খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হেরে গেল সেদিন রাতে ও তার পরের দিন বাংলাদেশে যেন খুশির উৎসব পালিত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাস্তায় রাস্তায় টিভি-তে ভারতের পরাজয় দেখে তারা উল্লাস, আনন্দ আর চিৎকারে রাত্রি উদ্‌যাপন করল।

শুধু সাধারণ জনতা নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নিউজ চ্যানেলের বিতর্ক সভাগুলিতেও বক্তাদের ভারত বিদ্বেষের কথা আমরা প্রায়ই শুনি। তবে এই বিদ্বেষের মূল কথাগুলি যদি মন দিয়ে শোনা যায় তাহলে সহজেই বোঝা যাবে সেগুলি যুক্তিহীন, অবাস্তব, এমনকী হাস্যকর। কিন্তু সেসব কথাই বাংলাদেশে মানুষ ক্রমাগত বলে চলেছে। যেমন ফাইনাল খেলার আগে বাংলাদেশের অশিক্ষিত জনতার অভিযোগ ছিল, আইসিসি মানেই ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল, আইসিসি ভারতের কথাতেই চলে, এবার আইসিসি ভারতীয় দলকে প্রচুর সুবিধা দিচ্ছে এবং তারা ঠিক করেই নিয়েছে ভারতকে বিশ্বকাপটা দিতে হবে ইত্যাদি। সেমিফাইনাল ম্যাচের পর বলা হলো রাতারাতি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচ বদলে ফেলা হয়েছে যাতে ভারত জিততে পারে। সকলেই জানেন এইসব অবাস্তব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

কিন্তু কেন এই ভারত বিদ্বেষ? ভারত তো বাংলাদেশকে বন্ধু দেশ হিসেবেই দেখে। সেখানকার সাধারণ জনতার যা অভিযোগ সমাজমাধ্যমের দ্বারা আমরা জানতে পারছি তা হলো ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে এবং মোদী সরকার সে দেশের আসন্ন নির্বাচনে হাসিনা সরকারকেই ক্ষমতায় আনতে চায়। ভারত খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-কে ক্ষমতায় আসতে দিতে চায় না। এটা হলো অন্যতম প্রধান অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগও অবাস্তব ও মনগড়া। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। সেখানকার সরকার কি এতটাই অপদার্থ যে ভারতের কথায় তারা নির্বাচন পরিচালনা করবে?

সেখানে নির্বাচন হয় সেখানকার আইন ও সংবিধান অনুসারে। এর মধ্যে মোদী সরকার কীভাবে ঢুকতে পারে? আমরা সাধারণ মানুষ। এর কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর খুঁজে পাই না।

তবে বাংলাদেশের এই ক্রমবর্ধমান ভারত বিদ্বেষের মূল কারণ হলো সে দেশে ক্রমশ বাড়তে থাকা পাকিস্তানপন্থী কট্টর ইসলামি মানসিকতা। ভারত একটি হিন্দুপ্রধান দেশ। তাই এদের কাছে ভারত হলো শত্রু দেশ। শরিয়তি ইসলামের এই মনোভাবের কথা বহু আগেই বলে গিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৯৩৪) তিনি লিখেছেন— 'ইহাদের কাছে ইসলামীয় মনোভাব মানে, মুখ্যত যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইহাদের চোখে 'কুফ্‌র' বা 'বিধর্মিত্ব' এবং 'শিরক্‌' বা বহু-দেব-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম এই কথাতেই যেন— 'কুফ্‌র্‌' ও 'শিরক্‌'-এর আমেজ লাগিয়া আছে।' এই কারণেই ভারত হলো এদের কাছে শত্রু দেশ। যুব সমাজের মনে এই শত্রুতার বীজ বপন করে চলেছে সে দেশে গড়ে ওঠা অসংখ্য মাদ্রাসা। কট্টরপন্থী ইসলামের কাছে সবসময় মজহব বড়ো— ভাষা নয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কও নয়। তাই বাংলাদেশের এই জনতা যেমন গাজা, প্যালেস্তাইন আর হামাসের সমর্থক তেমনি তারা রাজনৈতিক ভাবে বিএনপি এবং জামাতের সমর্থক। এরা অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, ধর্মীয় ভাবে উন্মাদ, হিন্দু বিরোধী; এবং এসবেরই শেষ সিদ্ধান্ত হলো ভারত বিরোধিতা। এদের প্রধান শত্রু আর কেউ নয়, ভারত। ভারতকে গালি দেবার, ভারতীয় দলের পরাজয়ে নিজেদের উল্লাস আর 'পৈশাচিক' আনন্দ উদ্‌যাপনের একটা সুযোগ পাওয়া গেল ক্রিকেট বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে এবং তার মাধ্যম হয়ে উঠল ফেসবুক, ইউটিউব-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম।

আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের কবল থেকে উদ্ধার করে স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিতে অনেক রক্ত দিয়েছে ভারত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সফলতা পেত না ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে। এতে ভারতের স্বার্থ ছিল ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশ গড়ে উঠত না ভারতীয় সেনার হস্তক্ষেপ এবং বহু সেনার বলিদান ছাড়া। বাংলাদেশের জন্ম থেকে এবং তার বিপদের দিনে ভারত তার পাশে দাঁড়িয়েছে। আজ যারা ভারতের পরাজয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করছে তখন এদের জন্ম হয়নি ঠিকই, কিন্তু একটা জাতির তাদের ইতিহাস এত সহজেই ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। শয়ে শয়ে বাংলাদেশি প্রতিদিন ভারতে আসেন মূলত চিকিৎসার কারণে। কলকাতা এবং দক্ষিণ ভারতের হাসপাতালগুলিতে বাংলাদেশি রুগিদের ভিড় দেখা যায়। সুস্থ হয়ে তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। শুধু কি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই? বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি ও তার যন্ত্রপাতি, রেলইঞ্জিন, বস্ত্র উৎপাদন, কম্পিউটার ও তার যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুর বাণিজ্য ভারতের মাধ্যমেই হয়। আর বাংলাদেশের অশিক্ষিত জনতা অভিযোগ করে ভারত বাণিজ্যের নামে সে দেশকে শোষণ করছে। নইলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হবে কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? জগমোহন ডালমিয়ার বদান্যতা ছাড়া যে দেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্থানই পেত না, সে দেশের ক্রিকেট-পাগল জনতা আজ ভারতকে গালি পাড়ছে। এতখানি অকৃতজ্ঞ দেশ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

আসলে মজহবি কট্টর পন্থাকে অবলম্বন করে যে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে, অশিক্ষাই হলো তাদের মুল কথা। কোনো শিক্ষিত সজ্জন মানুষ এদের মধ্যে নিজের মুক্তমনের কথা প্রকাশ করতে ভয় পাবেন। তা করতে গেলে হয়তো তসলিমা নাসরিনের মতো তাঁর অবস্থা হবে। এই ক্রমবর্ধমান কট্টরপন্থার বর্তমান কারণ যদি হয় মাদ্রাসা শিক্ষা তাহলে আর একটি কারণ নিহিত আছে কিছুকাল আগের ইতিহাসে। হিন্দুরাই পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সজ্জন সমৃদ্ধিশালী জনগোষ্ঠী ছিলেন। দেশভাগের কারণে তাঁদের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে চলে আসতে হয়েছে। মুসলমান জনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও শিক্ষা দীক্ষায় তাঁরা ততখানি উন্নত ছিলেন না। এরা অনেকেই ছিল কৃষি শ্রমিক। এদের কোনোদিনই শিক্ষা, দীক্ষা, রুচিশীলতা ছিল না। হিন্দুদের তাড়িয়ে সব সম্পত্তি এরা দখল করেছে। ধর্মীয় উগ্রপন্থাকে অবলম্বন করে ক্রমশ এরাই হয়ে উঠল দেশের মালিক।

এদেরই বংশধরেরা যেমন হিন্দু বিরোধী, তেমনি ভারত বিরোধী। সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তার কারণে আমরা জানতে পারছি কী অপরিসীম ভারত বিদ্বেষ এবং ভারতের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বাংলাদেশের যুব সমাজ দিন কাটাচ্ছে। তারা কী আবার পাকিস্তানের অধীনে চলে যেতে চায়? বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা কী ভাবছেন? ভারত সরকারেরও উচিত এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভারত- বাংলাদেশ মৈত্রীর বিষয় সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবনাচিন্তা করার সময় এসে গেছে। □

ভারতবর্ষ বীরযোদ্ধাদেরও দেশ

অমলেশ মিশ্র

একটি ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শত শত অত্যাচার ও নৃশংসতা সহ্য করেও উজ্জ্বল রাখা যায়। এটি কি গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয় নয়? এটি কি ভারতীয়দের কাছে পরম গর্বের বিষয় নয়? বিদেশি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত বর্তমান কিছু ইন্ডিয়ানের কাছে ভারতীয়রা পরাস্ত হয়ে অবলুপ্ত হয়ে যাবে? ভারতের বীর যোদ্ধারা আমাদের কাছে অপমানিত হবেন? তা কি গবেষণার বিষয় নয়?

আমরা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলির কথা পুস্তকে পড়ে থাকি। মায়া সভ্যতা, রেড ইন্ডিয়ান সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা এবং ওইসব বিষয়সমূহ নিয়ে রচিত বহুবিধ পুস্তক আমাদের জ্ঞানের সূত্র। কিন্তু ওইসব উৎপাটিত ও মৃত— সবই ফসিলে পরিণত হয়েছে।

একমাত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিই (যাকে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলা হয়) একই রকম লুণ্ঠন, অত্যাচার, ব্যভিচার, নৃশংসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আজও বেঁচে আছে, সজীব আছে। তাকে পরিহাস করা হচ্ছে, বিকৃত করা হচ্ছে, তার অঙ্গছেদন করা হচ্ছে, তবুও সেটি জীবিত। এই কথা ভাবলেই কি শরীরে শিহরণ হয় না? কত শত যোদ্ধা হলে এই ২২০০-২৩০০ বছর ব্যাপী যুদ্ধ করা সম্ভব? এই যুদ্ধ বরাবরই ছিল, এখনও আছে— বহুমুখী যুদ্ধ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৈহিক ও আত্মিক।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে 'যোদ্ধা' বলে পৃথিবী চেনে না, ভারতের রাজনৈতিক শক্তিগুলি চেনে না। ভারতবর্ষের পরিচয় দেওয়া হয়— আধ্যাত্মিকতার দেশ বলে, এটি যোদ্ধাদেশ নয়। কেউ কি ভেবেছেন যে এই আধ্যাত্মিকতাই যোদ্ধা ভারতবাসী-দের শত শত বছর ধরে প্রেরণা দিয়েছিল? সারা বিশ্বের

ভারতবর্ষকে সারা বিশ্ব আধ্যাত্মিকতা ও অহিংসার দেশ বলে চেনে এবং এই মর্মে প্রচার করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার দেশ নয়, বীরযোদ্ধাদেরও দেশ। আর ভারতবর্ষ অহিংস ঠিকই তবে সে অহিংসা 'গীতা'র অহিংসা, শ্রীকৃষ্ণের অহিংসা--- ইংরেজ প্রেমী কোনো ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক নেতার ক্লীব সুলভ অহিংসা নয়। ভারতীয়দের আরাধ্য দেব-দেবীরা সকলেই সশস্ত্র।

আমি যদি 'যোদ্ধা ভারতবাসী' বলি, তাহলে ইন্ডিয়ানদের উপহাসের পাত্র হবো। কিন্তু একথা ভেবে গর্বিত হওয়া দরকার যে যখন পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতাগুলি বিদেশি মজহব ও রাজশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে অবলুপ্ত হয়েছিল, তখন একমাত্র এই ভারতবর্ষই সেই খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ২২০০-২৩০০ বছর ব্যাপী বিদেশি মত-পথ ও বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এবং তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভারতীয় বীর যোদ্ধাদের কারণেই। দেশে অন্তর্ভুক্ত বহুবিধ রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত থাকায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়তো করেনি কিন্তু কেউই অবলুপ্ত হতে দেয়নি।

ফলে গ্রিস, রোম, মিশর, ব্যবিলন বা মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনত্ব আছে কিন্তু ধারাবাহিকতা নাই। ভারতবর্ষই সারা বিশ্বে একমাত্র দেশ যে তার প্রাচীনত্ব ও ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বজায় রাখতে পেরেছে।

অনুমান করুন, কত যোদ্ধা থাকলে সুদীর্ঘ ২৩০০ বছর ব্যাপী

রিলিজিয়নগুলি ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রবর্তিত— মোজেস, যিশু, মহম্মদ। কিন্তু ভারতের ধর্ম প্রবর্তিত নয়, আবর্তিত। যারা ধর্ম ও রিলিজিয়ন শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করেন— তাঁরা গুরুতর ভুল করেন। এই সনাতন ভারতীয় ধর্মই (হিন্দুধর্ম) ভারতীয় যোদ্ধাদের শত শত বছর ধরে শক্তি জুগিয়ে এসেছে।

আধুনিক পণ্ডিতদের একটি বৃহৎ অংশ, ভারতের এই আধ্যাত্মিকতাকেই ভারতবাসীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এই দেশকে একটি দুর্বল দেশ ও দুর্বল জাতি হিসাবে চিত্রিত করেছেন। প্রচার করেছেন— এ দেশ আধ্যাত্মিকতা দেশ, এ আবার যুদ্ধ করবে কী? কোথায় এদের হারকিউলিস, অ্যাকিলিস, হ্যানিবল, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, কাস্ত্রো, চে-গুয়েভারা, মামুদ, ঘোরি, তৈমুর লঙ, নাদির শাহ, আহমেদ শা আবদালি, বাবর, আকবর, ঔরঙ্গজেব?

চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, পুরু, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, যশোধর্মণ, দাহির, রাণা প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী বা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খবর কে রাখে? তার ইতিহাস কোথায়? কে পড়ে? শিশুরা পড়ে না, তরুণ-তরুণীরা পড়ে না, যুবক-যুবতীরা পড়ে না, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউই পড়ে না। শুধু পড়া নয়, এদের গল্পও শোনে না। ভারতবর্ষ হয়ে গেল আধ্যাত্মিকতার দেশ, যোদ্ধাদের দেশ নয়। ভারতবর্ষ দেশটি হলো ইন্ডিয়া।

পরিচয় হলো— দুর্বল হিন্দু। লেখা হলো— 'অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া না জানে সন্তরণ।' সন্তরণ না জানলে, অসহায় ও দুর্বল হলে ২২০০-২৩০০ বছরব্যাপী বিদেশি রাজশক্তি ও মজহবশক্তিকে মোকাবিলা করে এই ভারতবর্ষ থাকত না। একটা মিশর, গ্রিস, রোম বা ব্যবিলন হয়ে ফসিল হয়ে যেত।

তবে যেভাবে এখন চলছে, এভাবে চললে এই ভারতবর্ষও ফসিল হয়ে যাবে। সেই সম্ভাব্য ফসিলীভবন রুখতে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ- বনিতাকে যোদ্ধা ভারতবাসীর কথা জানতে হবে।

কবি ম্যাথিউ আর্নল্ড একটি কবিতায় লিখলেন— The East bow'd we before the blast, In patient, deep disdain; She let the legious thunder past, And plunged in thought anain. অর্থাৎ শান্ত অবজ্ঞায় প্রাচ্য নতিস্বীকার করল, উষ্ণ সৈন্যদলকে চলে যেতে দিল এবং আবার চিন্তায় (আধ্যাত্মিকতায়) সমাহিত হলো।

সত্যিই কি তাই হয়েছিল? তাহলে গ্রিক, পার্শিয়ান, শক, হূন, পাঠান, মুঘল, তুর্কি এবং ইংরেজ— ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো কেন? কেন ইংরেজ বাধ্য হয়ে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাওয়ার ঘোষণা করল? ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরে কিছু রাজনৈতিক বা সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র বাহিনীকে ভয় পেয়েই তারা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তা কথোপকথনে জানিয়েছেন অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীকে ১৯৫৬ সালে। আর ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে পালিত পোষিত কিছু ইন্ডিয়ানের হাতে যারা যোদ্ধা ভারতবাসীদের ভয় পেত হয়তো তাদের জানতই না।

ভারতের ইতিহাস যে সব ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ইংল্যান্ডে বসে থেকেই রচনা করেছিলেন— তারা না জানতেন ভারতীয় যোদ্ধাদের এবং তাদের প্রেরণাদায়ী শক্তিকে। বহু ভারতীয় যাঁরা ম্যাথিউ আর্নল্ড-এর কবিতা পড়েছেন তাঁরা প্রচার করেছেন যে, দেখ, ভারত কতবড়ো আধ্যাত্মিক দেশ। এরা বা এদের প্রভু ইংরেজরা এই আধ্যাত্মিকতায় সামান্যতম আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তারা একে ব্যবহার করেছে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও শোষণের কাজে। তারা বলতে চেয়েছে, দেখ, ভারতবর্ষ বরাবরই পরাধীন, এরা কখনও যুদ্ধ করেনি, যদি-বা করেছে, পরাজিত হয়েছে। তাই আর্যরা, গ্রিকেরা, পার্শিয়ানরা, শক ও কুষাণরা, আরবীয় ও তুর্কিরা, পার্সিয়ান, পর্তুগিজ ও ডাচ ও ফরাসিরা এবং শেষমেশ ইংরেজরা এই দেশ অধিকার করেছে। এটি একটি আজন্ম পরাধীন দেশ।

জেমস্ মিল, ভারতের ইতিহাসকে এবং ম্যাক্সমুলার প্রমুখ ভাড়া করা বিদ্বজনেরা ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত না করলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড়ো দেশ এতকাল পদানত রাখত কী করে? ভারতবাসীকে মনের দিক থেকে দুর্বল, হীনম্মন্য ও দাস মানসিকতা- সম্পন্ন করতে হলে শয়নে-স্বপনে-অধ্যয়নে শুনিয়ে যেতে হবে যে, তোমরা যোদ্ধাদেশ নও, আধ্যাত্মিক দেশ। পরাধীনতাই তোমাদের বিধিলিপি। কেউ ভাবল না যে এটি একটি বীরের দেশ না হলে দীর্ঘ ২২০০-২৩০০ বছর ওরা নিজেদের স্বকীয়তা, আধ্যাত্মিকতা টিকিয়ে রাখল কী করে?

ইতিহাস বলছে যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের মতো কোনো দেশ বিশ্বে ছিল না। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু প্রতিভার বিকাশ নানাদিক দিয়ে হয়েছিল। মুসলমান বিজয়ের ফলে সে বিকাশের পথ কিছুদিনের পথ কিছু দিনের জন্য রুদ্ধ হয়। কোনো দেশে ওই যুগে ব্যাস, বাল্মীকির মতো মহাকবি, কালিদাস, ভবভূতির মতো কবি; শূদ্রকের মতো নাট্যকার, বিষ্ণুশর্মার মতো গল্প লেখক; যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, আদি শঙ্করের মতো দার্শনিক; পাণিনি, কাত্যায়নের মতো বৈয়াকরণ; আচার্য পিঙ্গলের মতো ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ; আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ; চরক ও সুশ্রুতের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ; কৌটিল্যের মতো অর্থশাস্ত্রকার এবং নাগার্জুনের মতো রাসায়নিক কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেননি।

ভারতের ইতিহাস লেখক, মুসলমান ও মার্কসবাদী অধ্যাপক ও পুস্তক রচয়িতারা ভারতবর্ষকে হীন করার জন্য ইংরেজ-খ্রিস্টানদের মানসিকতায় আপ্লুত হলেন। পেশা ও বৃত্তিগত উচ্চপদলাভে তাঁদের যোগ্যতার থেকে এই মানসিকতার যোগ্যতা বেশি বিবেচিত হলো। তাঁরা শিক্ষকতা (কলেজ ও ইউনিভার্সিটি) করলেন, পুস্তক প্রণয়ন করলেন। সেগুলিই ১৫০-২০০ বছর ধরে পড়ানো হতে লাগল। সেই পাঠ্যবইতে আলেকজান্ডার মহান, আলাউদ্দিন, আকবর মহান, নেপোলিয়ন মহান। নামে মাত্র অবস্থান চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, বিক্রমাদিত্য, পুরু, দাহির, পুষ্যমিত্র প্রমুখের নাম। বিশাল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, শিবাজীর স্বপ্ন ম্লান। উজ্জ্বল হলো আকবর, ঔরঙ্গজেব, রানি ভিক্টোরিয়ার স্বপ্ন।

ভারতের যে ইতিহাস পড়ে ভারতীয়রা হীনম্মন্য ও ক্লীব হয়ে গেল, সে ইতিহাস শুধু ভারত আক্রমণকারীদের ইতিহাস; ভারতীয় যোদ্ধাদের ইতিহাস নয়। কীভাবে দেশটা পুরোপুরি ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান হয়ে গেল সে ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় মর্যাদা পেতে গেলে ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় বীর যোদ্ধাদের কথা, তাঁদের সংগ্রামের কথা, তাদের কৃতিত্বের কথা পড়াতে হবে। হীনম্মন্যতা, দুর্নীতি, অনুন্নতি ঠেকাতে গেলে দেশের মহান মানুষদের কথা পড়াত হবে। দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে হবে। ভারতের ৫০ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতীয়দের সমগ্র সংগ্রামের ইতিহাসের অতি সামান্য অংশ মাত্র। শুধু বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে নয়, তাবৎ বিদেশিদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামের ইতিহাস জানা দরকার ভারতীয় বিদ্যার্থীদের।

ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, চিত্রকলা, শাসন ব্যবস্থা, সমাজ কল্যাণের উদ্যোগ, গভীর জাতীয়তাবোধ পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আনতে হবে যাতে বিদ্যার্থীরা অনুপ্রাণিত হতে পারে, দেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। ভেবে দেখেছেন কি যে ১৪০ কোটি ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে ১১ জন এমন ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি হলো না আজও যারা বিশ্ব ফুটবল খেলায় যোগ দিতে পারে! অথচ ঘানা, কোস্টারিকা পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলে। জাপান, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা অলিম্পিকে অনেকে স্বর্ণপদক পায়, ভারত পায় না।

ভারতের রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতিপরায়ণ, অসংবেদনশীল এবং দেশের প্রতি দায়িত্বহীন। ক্ষমতা থাকলে হয়তো দুর্নীতি থাকবে কিন্তু কত শতাংশ? ১০০ : ২০, ১০০ : ৮০? কেন এমন হয়েছে? গবেষণা করলে জানা যাবে যে এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কৈশোরে ও যৌবনে দেশভক্তির শিক্ষা পাননি। এদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধের একান্ত অভাব। এরা উপদেশ দেন, জনতা শোনেন কিন্তু অনুপ্রাণিত হন না। যিনি নিজে দুর্বৃত্ত তিনি অনুপ্রেরণা দেবেন কী করে? এঁরা দুর্নীতিতে অনুপ্রাণিত, দেশ ভক্তিতে নন। দেশের মানুষও তাই দুর্নীতির বিরোধিতা করেন না, দুর্নীতির অংশ চান। যে কোনো ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধি উল্লঙ্ঘলেই এদের বীরত্ব।

আত্মসম্মান বোধের অভাবে এঁরা দুর্নীতি করেও লজ্জিত নন। বিশৃঙ্খলাই নিয়ম হয়ে গেছে। ভাবলেনই না যে বিশৃঙ্খলার কারণ— ন্যায়ের অভাব। ন্যায় থাকলেই শৃঙ্খলা থাকে, শৃঙ্খলা থাকলেই প্রগতি হয়। চারিদিকে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী ও ধর্মীয় ষড়যন্ত্র! এই দেশের যে একটি বিরাট আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট ছিল তা হারিয়ে গেছে—সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও মজহবি ষড়যন্ত্রের উন্মাদনায়। ভারতের যোদ্ধারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন। হিন্দুত্ব থেকে বীরত্ব, দেশাভিমান ও দেশভক্তি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই পররাজ্যগ্রাসী খ্রিস্টান ও মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য দেশে এত প্রতিরোধে যত বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, মোকাবিলা তাদের করতে হয়নি।

পাঠ্যপুস্তকে আমাদের দেশের ইতিহাস কেবল ভারতবাসীর ব্যর্থতাও পরাজয়ের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস নয়। সেগুলি পড়ে পড়ে আমরা দুর্বল ও হীনম্মন্য হয়ে সেবাদাসে পরিণত হয়েছি। কেবল নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কথাই ভেবেছি, দেশের কথা ভাবিনি। স্বার্থত্যাগের যে শিক্ষা ভারতের বীর যোদ্ধারা দিয়েছিলেন— তা আমরা পড়িনি, আমরা জানি না। ইতিহাসের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করেছে। গোপনে যিনি মহান ব্রিটিশ প্রেমিক, প্রকাশ্যে তিনি হয়ে গেলেন মহান দেশপ্রেমিক— কেবল প্রচারের দৌলতে।

রাজনীতির কারবারিরা প্রচার করেছে যে—

(১) দেশের বিপ্লবী ও বীর যোদ্ধাদের বিদ্রোহী বলতে হবে আর আক্রমণকারী বিদেশি লুঠেরাদের কুর্নিশ/স্যালুট করে সম্মান জানাতে হবে। গোপন ব্রিটিশ প্রেমিকদের সম্মান জানাতে হবে। সেই বিদেশিরা কতজনকে হত্যা করেছে, কত অত্যাচার ও নৃশংসতা করেছে, কত নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, কত ধর্মস্থান ও ধর্মপুস্তক নষ্ট করেছে— ইতিহাস পুস্তকে বা বক্তৃতায় তার উল্লেখ করা যাবে না।

(২) যদি কেউ বা কারা নিজ নিজ রিলিজিয়নের কারণে ওইসব করে থাকে তবে সেগুলি ধর্মীয় বিষয় বলে ব্যাখ্যা করে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে। বলতে হবে সব ধর্মই সমান।

(৩) নিজ ধর্মের (হিন্দু /ভারতীয়) সাধুসন্তদের যা খুশি বলা যাবে কিন্তু অন্য রিলিজিয়নের সাধুসন্তদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখাতে হবে। সিরনি, মোমবাতি ব্যবহার করতে হবে, চাদর চড়াতে হবে।

(৪) যারা তোমার (হিন্দু/সনাতনী) ধর্ম আচরণে বাধা দিচ্ছে, দাঙ্গা কাছের গায়ের জোরে দখল করছে তাদের সম্পর্কে প্রচণ্ড সহনশীল হতে হবে, কারণ আমার ধর্ম অহিংসার ধর্ম।

(৫) রক্তক্ষয় ও দাঙ্গা এড়ানোর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে হবে।

ইতিহাস গবেষক ড. রামগোপাল বলেছেন, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেসব দেশের প্রাচীন ও দেশজ ধর্ম বিদেশিদের (ইসলাম ও খ্রিস্টান) আক্রমণে উৎপাটিত ও অবলুপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার কারণ হলো, সেসব দেশের মানুষের মধ্যে তাদের দেশের দেশজ ধর্মের প্রভাব কমে গেছিল। ভারতবর্ষে ধর্ম-জীবনযাত্রায় অঙ্গ ও পদ্ধতি হয়ে যাওয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে ওই প্রভাব কমেনি। তাই ভারতবর্ষ বিদেশি আক্রমণ রুখতে ভয়ংকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ভারতীয়দের কাছে জন্মভূমি মাতৃভূমি— মায়ের মতো। ধর্মরক্ষার অর্থ জীবন রক্ষা এবং জীবন রক্ষার অর্থ হলো ধর্ম রক্ষা। এই ধারণা ভারতীয়দের মজ্জাগত। আজ যে বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় তার কারণ হলো বিদেশিদের অধীনে জীবনযাপন করা এবং তা দীর্ঘকাল ধরে। বিদেশিদের অনুকরণ করায় জীবনযাপনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারপুরুষার্থ ধর্ম ও মোক্ষ এই দুই পুরুষার্থের বাঁধনে থাকতেন। এখন জীবনের লক্ষ্য হয়েছে কেবল মাত্র দুটি পুরুষার্থ— অর্থ ও কাম।

যে বীর যোদ্ধারা ২২০০-২৩০০ বছর যুদ্ধ করে বিদেশিদের গ্রাস থেকে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছিলেন— তাঁরা অর্থ ও কাম পুরুষার্থকে ধর্ম ও মোক্ষ এই বাঁধনের মধ্যে রাখতেন। তাই এখন বিক্রীত ও বিকৃত সেবাদাস বহু আছে শুধুমাত্র বীর যোদ্ধাদের অভাব হয়েছে। ◻

চার রাজ্যের ফলাফলে চব্বিশের রাস্তা প্রশস্ত হলো

শ্যামল কুমার হাতি

চার রাজ্যের ভোটের ফলাফলে জনগণের স্বপ্ন নরেন্দ্র মোদীর সংকল্পে পরিণত হলো। ভারতের জনগণ স্থায়িত্ব ও বিকশিত ভারত দেখতে চায়। দেশের মানুষের হৃদয়ে দুর্নীতি ও পরিবারবাদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুত্বকে অপমানের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে মানুষ। তাই রাজস্থানে বিজেপিকে দিয়েছে ১১৫টি আসন, কংগ্রেস সেখানে পেয়েছে ৬৯টি, অন্যরা পেয়েছে ১৫টি। সরকার কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেল বিজেপির কাছে। জনগণের আশা, বিজেপির দ্বারাই পিছিয়ে পড়া রাজস্থানে বিকাশ হবে।

ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের সরকার ছিল। ওরা জনজাতিদের বঞ্চিত করেছিল। ওদের দুর্নীতির মুখ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়রা। জনগণ বুঝেছিল কংগ্রেসের কারণে রাজ্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই তারা বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর দলকে আশীর্বাদ করে ৯০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় ৫৪টি আসন দিয়ে সরকার গঠনের ভার দিয়েছে। কংগ্রেস পায় ৩৫। এখানেও সরকার ছিল কংগ্রেসের। এবার রাজ্যের জনগণ তাদের রাজ্যের ভার তুলে দিল বিজেপির হাতে। কংগ্রেস এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে ফল ঘোষণার পর I.N.D.I.A. জোটের পরবর্তী সভা ওখানেই করতে চেয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশে সরকার ছিল বিজেপির। জনগণ তাদের শাসনে খুশি হয়ে আরও বেশি আসন বেশি দিয়ে বিজেপিকে পুনরায় সরকার গড়ার ভার দিয়েছে। সেখানে জনগণ তাদের এবার রেকর্ড ১৬৩টি আসন দিয়েছে। ২৩০ আসনবিশিষ্ট মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপিকে ১৬৩টি আসন দিয়ে সেখানে আবার সরকার গড়ার ভার দিয়েছে। কংগ্রেস সেখানে পায় মাত্র ৬৬টি আসন। এক শ্রেণীর সাংবাদিক, কলামনিস্ট ও মিডিয়া বিজেপির পরাজয়ের খবর আগেই ফলাও করে প্রচার

করেছিল। মানুষ তাদের মুখে ঝাড়ু মেরে ঝামা ঘষে দিয়েছে।

তেলেঙ্গানায় সরকার ছিল বিআরএসের হাতে। এবার কংগ্রেস পেল তেলেঙ্গানার ভার। এই রাজ্যে জয় না পেলে কংগ্রেসের বিপক্ষে ফল হতো ৪-০। তেলেঙ্গানা জয়ে ফলাফল হয়েছে ৩-১। ১১৯ আসন বিশিষ্ট তেলেঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছে ৬৪টি আসন। বিআরএস পেয়েছ ৩৯টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ৮টি আসন। বিজেপি আগের বিধানসভায় পেয়েছিল ১টি আসন। এবার সেটাই বেড়ে হয়েছে ৮। বিজেপি ক্রমাগত এখানে বেড়েই চলেছে। এবার চার রাজ্যে নির্বাচন হয়েছিল ৬৩৮ আসনে। সেখানে বিজেপি পেয়েছে ৩৪০টি আসন। আর কংগ্রেস সেখানে পেয়েছে ২৩৪টি আসন। এটা পরিষ্কার যে, মানুষ কংগ্রেসকে এবার পরিত্যাগ করেছে। তার কারণ হলো—

(ক) কংগ্রেসের মিথ্যা ন্যারেটিভ মানুষ বিশ্বাস করেনি। যদি কংগ্রেস এবং তার লেজুড় দলগুলি এবারও তাদের এই নোংরামি বন্ধ না করে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

(খ) হিন্দুত্বকে আক্রমেণের প্রচেষ্টা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের পুত্র হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে জঘন্য উক্তি করেছে তার প্রতিবাদে I.N.D.I.A. জোটের কোনো দল নিন্দা না করে তা তরিয়ে তরিয়ে উপভোগ করেছে। তারই প্রতিবাদের প্রতিফলন এই নির্বাচনের ফলাফলে ঘটেছে।

(গ) কংগ্রেসের জাতিগণনার অ্যাজেন্ডা আসলে হিন্দুসমাজে বিভাজনের অপচেষ্টা, মানুষ তা গ্রহণ করেনি।

(ঘ) দেশের প্রধানমন্ত্রী সবার প্রধানমন্ত্রী। আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতা। রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের তরফে তাঁকেই মিথ্যা দোষারোপ ও ক্রমাগত আক্রমণ দেশের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি।

(ঙ) ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে শ্রীরামজন্মভূমির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিতর্কিত ধাঁচার পক্ষে সওয়াল করা কংগ্রেসকে তার এই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে।

(চ) কংগ্রেস জনজাতিদের অবহেলা করেছে। তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। জনজাতি সমাজ বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বাস করেছে আর কংগ্রেসের অবহেলার জবাব দিয়েছে।

(ছ) দেশের নারীশক্তি বিজেপির ওপর বিশ্বাস রেখেছে। বিজেপির কাজে আজ ভারতীয় নারী সমাজ শক্তিশালী হয়েছে।

(জ) পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্য বিজেপি কাজ করেছে। তাদের আশীর্বাদ বিজেপি পেয়েছে। বিজেপির দেশভক্তি মানুষের মনে ধরেছে। শুধু বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করে কংগ্রেস খবরের হেড লাইনে এলেও মানুষের হৃদয়ে ঢুকতে পারেনি। এই ভাবেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বিজেপি পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবে।

ক্রিকেট খেলা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়

গত ১৫ নভেম্বর ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল খেলা হয় আরব সাগরের বুকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারত-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ হতে দেখেছি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তখন মনে হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, হামাসের যুদ্ধ থেকে ক্রিকেটের উত্তেজনা-বাঙ্গালির আবেগের কোথাও খামতি নেই। যখন ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচ হয় তখন সে কী উত্তেজনা! ছয় হাঁকালে স্টেডিয়ামে বসে থাকা দর্শকের গলা ফাটানোর আওয়াজ হাইকোর্টের অলিতে গলিতে ধ্বনিত হয়। হাইকোর্ট থেকে আমরাও বুঝে যাই ছক্কা মারার উত্তেজনা। বাঙ্গালির এমনই আবেগ। এখানে যখন ম্যাচ হয় তখন সব জায়গায় দর্শকদের দখলে চলে যায়। সে কী ভিড়! ভাবি, এতো টাকা দিয়ে কারা খেলা দেখে? যুদ্ধ থেকে খেলা শুধু আবেগের মেলা। আমার তখন মনে হয় আমরা উদ্বাস্তু। আমাদের এখানে কোথাও স্থান নেই। সর্বত্র নো এন্ট্রি। বাস চলাচল বন্ধ। তখন সে কী নৈরাজ্য! অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে তখন ট্রেন ধরার তাড়া থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ইডেনের ক্রিকেট ম্যাচের ১ হাজার টাকা টিকিটের মূল্য ১০-২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকায় ব্ল্যাক হয়। আমি সেদিন ট্যাক্সি করে হাইকোর্ট থেকে দূরদর্শনে যাচ্ছিলাম। ড্রাইভার বলল— কী দিন এসেছে দেখুন।

ভাবি, সত্যি আমরা গরিব? ৫০০ টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যে তীব্র রোদের মধ্যে মায়েদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইন দিতে দেখেছি। কারুর কোলে ছেলেও আছে। আবার বিপরীত দৃশ্যও দেখা যায়। অতি উৎসাহী ক্রিকেট দর্শকদের মতো পূজার মরশুমে কোনো এক দামি ব্র্যান্ডের জুতোর শোরুমের সামনে লম্বা লাইন। কখনো কারোর পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুও হতে দেখা যায়। দারিদ্রের-বৈভবের প্রভেদ কেমন প্রকট হয়ে ওঠে। বাঙ্গালির আবেগের শেষ নেই। বাঙ্গালির হৃদয় ভাঙা হতে পারে কিন্তু ভাঙা হৃদয় আবেগে ভরপুর। গতবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা-মেসি বনাম এমবাপেকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে সেকী উত্তেজনা! ওই খেলা দেখতে দেখতে কত দর্শকের উত্তেজনায় স্ট্রোক হয়েছিল। আমার বান্ধবীর মা একজন রিটায়ার্ড শিক্ষিকা, খেলা দেখার উত্তেজনায় সারারাত ঘুমাতে পারেননি। বান্ধবী রাতে ফোন করে বললেন 'জানো, মা ঘুমাতে পারছেন না।' রাতে ডাক্তার ডাকতে হলো। এখন বোঝা যায় বাঙ্গালি শুধু রক্তে-মাংসে গড়া নয়, আবেগ, অনুভূতি দিয়েও গড়া। কোথায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা আর কোথায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি। এমন বাঙ্গালির তার হৃতগৌরব কেমন করে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা করে? বাঙ্গালির এখন দেশ নেই (এখানে দেশ ভাগের কথা ধরে নিতে হবে)। উদ্বাস্তু বাঙ্গালি এখন স্রোতের টানে ভেসে আছে শুধু আবেগ নিয়ে।

গত ৫ নভেম্বর ইডেনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারতের জয়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কোন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল! উত্তেজনার বশে বাজি ফাটানোর কারণে কর্তব্যরত পুলিশের কয়েকটা ঘোড়াকে তখন ছটফট করতে দেখা যায়। রাতে আস্তাবলে একটি ঘোড়া হৃদরোগে মারা যায় যা নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে হইচই পড়ে যায়। এমন মৃত্যুখেলা থেকে নিষ্পাপ বন্যরাও রক্ষা পায় না। ক্রিকেট খেলায় শুধু আবেগ, উত্তেজনা, টিকিট ব্ল্যাক থাকবে? মারপিট, হাঙ্গামা থাকবে না তাই কোনোদিন হয়? ইডেনে যখন ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ হয়, উত্তেজনার পারদ তখন সপ্তমে যায়। ওই ম্যাচকে কেন্দ্র করে পথে ঘাটে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখন মনে হয় জেএনইউ-তে কিংবা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র নামধারী কোনো জেহাদি আজাদ কাশ্মীরের ডাক দিচ্ছে। অবশ্য সে হাঁক-ডাক এখন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কখনো-বা মনে হয় খেলাকে কেন্দ্র করে কোথাও কার্গিলের যুদ্ধ হচ্ছে। ভারত প্রেমীদের সঙ্গে পাকিস্তান পন্থীদের যুদ্ধ বাঁধে বলে কথা। সেকুলার পন্থীরা তখন কোথায় উধাও হয়ে যায়। ক্রিকেট খেলা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে এ খেলা খেলা যুদ্ধ। ভারত বিদ্বেষী বিষ ধর্মের আড়ালে সর্বদা লালিত পালিত হচ্ছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও হানাদারদের অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন দেখি না।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা সকাল থেকে উত্তেজনা ছিল। কয়েকদিন ধরে একটাই আলোচনা ছিল শুধু ক্রিকেট। দারুণ টিম ইন্ডিয়া, আমরা জিতছি। ক্রিকেট জ্বরে আমরা কেমন ছটফট করছি। সকাল থেকে চাপা উত্তেজনায় অস্থির, উৎবিগ্ন। মনে হচ্ছিল খেলা দেখে এখনই আমরা দেশ উদ্ধার করবো। আমরা কত বড়ো দেশপ্রেমিকের দল! টসে জিতে ভারতের হাতে প্রথম ব্যাট। খুব আনন্দ। আস্তে আস্তে সব উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান ৫০ ওভারে। তখন আর উত্তেজনা নেই। শুধু হতাশা। বেগতিক বুঝে ঘর থেকে ক্রমশ রাস্তায় জনগণ বের হচ্ছিল। গাড়ি ঘোড়া চলাচল শুরু করেছিল। আশা নিরাশায় দোলে মন তখনও দোলা খাচ্ছিল যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়। অস্ট্রেলিয়ার জয় সব আশার জল ঢালে। তখন মনে হচ্ছিল টিম ইন্ডিয়ার মতো এতো জঘন্য টিম আর হয় না। আমরা ভুলে যাই ক্রিকেট খেলা, একটা কর্পোরেট হাউসের প্রচার, প্রসার, ব্যবসা—এটা মাথায় রেখে আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটা দরকার। ক্রিকেট খেলা নিয়ে এতো আবেগ ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

—সুবল সরদার,

মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

রাজ্যের বিকাশের জন্য অপদার্থ সরকার পরিবর্তন অনিবার্য

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে—

(ক) দমন-পীড়ন। দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদানকারীদের সঙ্গে যে পুলিশি নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি করতো আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার তার বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে ঠিক ওই একই আচরণ করছে। বিজেপির সভা করার, আন্দোলন করার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দেয় না। বারবার কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদনে বিজেপিকে এই

ফঃ ৩

রাজ্যে সভা ও আন্দোলন করতে হয়। ব্রিটিশ সরকার যেমন তাদের অনুগত কমিউনিস্ট পার্টি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে আন্দোলনে ও সভায় ছাড় দিত, আজও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারও একইভাবে বিজেপিকে হেয় করার জন্য বাম-কংগ্রেসকে সভা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছুট দিচ্ছে ভালোবেসে। তারপর এখন আবার I.N.D.I.A. জোটের তোড়জোড় চলছে। এখন তো আবার তৃণমূল-বাম ও কংগ্রেস একজোট। (খ) ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগী ছিল কবি, সাহিত্যিক। তাঁরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও তাদের কলম তলোয়ারের থেকেও শক্তিশালী ছিল। সারা ভারতে শত শত এমন কবি-সাহিত্যিক দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কবিতা, প্রবন্ধের এমনকী গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সৃষ্টি করে হাজার হাজার ছাত্র-যুবকদের উজ্জীবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মুকুন্দ দাস ও দাদাঠাকুররা ছিলেন অগ্রগণ্য। এদের কয়েক জনকে ব্রিটিশ সরকার নানা ভাবে পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানির স্বীকার হতে হয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবে আজ যখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লোভে, ভয়ে বা ভক্তিতে হোক লিখতে পারছে না। মানুষের সামনে সত্যটা না আসায় আশাহত হয়ে সমাজ মাধ্যমে বহু মানুষ সরাসরি বিজেপির আন্দোলনে যুক্ত না হয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সততা, পরিকল্পনা এবং জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বিজেপির আন্দোলনকে শক্তিশালী করে চলেছেন। ব্রিটিশ সরকার যেমন লেখক-কবিদের হেনস্থা করেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার সেই একই ধারায় বেশ কিছু সামাজিক মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুর্নীতির খবর তুলে ধরায় রাজ্য সরকার তাদের হেনস্থা অনবরত করে চলেছে।

(গ) ব্রিটিশ ভারতে কিছু পাওয়ার আশায় কবি সাহিত্যিকরা তাদের লেখা লেখেননি। তারা দেশমাতৃকার সেবার জন্য নিজেরাই কলমকে অস্ত্র হিসেবে ধারণ করেন, ঠিক তেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে শত শত মানুষ নিজের ইচ্ছায় সামাজিক মাধ্যমে মমতা সরকারের অপরাধের কথা তুলে ধরছেন কোনো কিছু পাওয়ার আশা না রেখে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের মানুষ ও সরকার কবি ও সাহিত্যিকদের কথা ভুলে যাননি। আমরা যারা স্বাধীন ভারতে জন্মেছি, সেই জন্যই আমরা সেই সব কবি সাহিত্যিকদের দেশপ্রেমের কথা জানতে পেরে শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। আশা রাখি যারা দূর থেকে সমাজ মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে চলেছে নিরন্তর, তাদের যেন আমরা ভুলে না যাই। তারা যেন আমাদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত না হয়।

—দীপা হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

র‍্যাগিং প্রতিরোধে চাই জিরো টলারেন্স নীতি

র‍্যাগিং এক দিক দিয়ে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে এক মনস্তাত্ত্বিক আনন্দসুখ। র‍্যাগিঙের প্রভাব গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অনেকেই হোস্টেল, মেস ছাড়তে বাধ্য হয়। বহু শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ আবার মানসিক রুগি হয়ে পড়ে। অনেকের মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু ঘটে। যারা একান্তই দুর্ভাগা, দুর্বল, তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। যারা র‍্যাগিং করে তারা খুব ভালো করেই জানে যে তারা অন্যায় করছে। তাই র‍্যাগিং শুধুমাত্র একটি সামাজিক ব্যাধি নয়, এটি একটি অত্যন্ত গর্হিতকাজ, খুনের মতোই সামাজিক অপরাধ। দুর্ভাগ্য এই যে, প্রিন্সিপ্যাল থেকে ডিন, হোস্টেল সুপার, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সবাই সব কিছু জেনেও চুপ থাকেন। করবেনই- বা কী! সর্ষেতেই তো ভূত। তাঁরা নিজেরাও হয়তো ছাত্র জীবনে কাউকে না কাউকে র‍্যাগিং করেছেন। তাই কলেজে, হোস্টেলের কোথায়, কোনখানে র‍্যাগিং হচ্ছে জানলেও, ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে হোক বা অন্য কারণে মুখ বুজে থাকাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

র‍্যাগিং নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) প্রাক্তন সিবিআই প্রধান আর কে রাঘবনের নেতৃত্বে একটি র‍্যাগিং বিরোধী কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ২০০৯ সালে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল হোস্টেল, ক্যাম্পাসে সিসিটিভি স্থাপন। কিন্তু ব্যক্তি গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ই তা করেনি। তাদের মধ্যে অন্যতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সময় যেসব ছাত্র সংগঠন, পড়ুয়া, অধ্যাপক সিসিটিভি, র‍্যাগিং নির্দেশিকার বিরোধিতা করেছিলেন, তারাই আজ নির্লজ্জ ভাবে লোকদেখানো র‍্যাগিং বিরোধী মিছিল বার করছেন, চ্যানেলে চ্যানেলে রাজ্যপালের মুণ্ডপাত করছেন। এই আন্দোলনের ভগ্নাংশ পরিমাণও যদি র‍্যাগিং বিরোধী সচেতনতায় ব্যয় হতো, তবে কোনও পড়ুয়ার মা'র কোল শূন্য হতো না।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, মৃত্যুর ঘটনা বাদ দিলে, ধরা পড়লেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই র‍্যাগিং অপরাধীদের কোনও সাজা হয় না। পরিস্থিতি বেগতিক হলে অপরাধীরা ক্ষমাটমা চেয়ে নিয়ে অথবা অপরাধীদের ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ছাত্র আন্দোলনের চাপে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই আক্রান্ত পড়ুয়াকে অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য করেন। অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বদনামের ভয়ে কর্তৃপক্ষও বিষয়টি চেপে যান। ফলে র‍্যাগিংও বন্ধ না হয়ে বহাল তবিয়েতে চলতে থাকে। র‍্যাগিং বন্ধ করতে তাই প্রয়োজন জিরো টলারেন্স নীতি। কর্তৃপক্ষকে র‍্যাগিঙের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। কোনো ক্ষমাটমা নয়, সরাসরি বহিস্কার, দরকারে পুলিশে অভিযোগ। কোনো আন্দোলনের চাপে মাথা নোয়ানো চলবে না। প্রয়োজনে আন্দোলনকারীদেরও বহিষ্কার করতে হবে।

পড়ুয়াদেরও মাথায় রাখতে হবে কাউকে সহবৎ শেখানোর জন্য তারা কলেজে আসেনি। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', সেটাই তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই ভয়হীন, র‍্যাগিংমুক্ত, আনন্দদায়ক শিক্ষা পরিসর নির্মাণ সম্ভব।

—মন্দার গোস্বামী,
২৩, ঈশ্বরবাবুর গলি, খাগড়া, বহরমপুর।

বিজ্ঞাপন বিভ্রান্ত করছে মহিলাদের

সুতপা বসাক ভড়

স্বাধীনতার পরে ছিয়াত্তরটি বছর কেটে গেল। মেয়েদের শিক্ষা, মতামত, সংস্কার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে দেশে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যাপারেও আলোচনা হচ্ছে। আজকের মেয়েরা পড়াশোনা শিখে শুধুমাত্র বাড়িতেই বসে নেই। তারা দশভুজা মা-দুর্গার মতো সংসার, কর্মক্ষেত্র সবদিক সামলাতে দায়বদ্ধ। আর্থিক দিক থেকেও পরমুখাপেক্ষী নয় এই কার্যরতা মহিলারা। স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত উপার্জন নিঃসন্দেহে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনছে, আনছে নিরাপত্তা। এপর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মহিলাদের আয়ের একটা বড়ো অংশ সাজগোজ, বাহ্যিক আড়ম্বড়ে খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি তাদের অফিসে কর্মরতা মহিলাদের কিছু পাশ্চাত্য পোশাক নির্দিষ্ট করে দেয়। এইভাবে তারা আমাদের দেশের পারম্পরিক পোশাককে পরোক্ষভাবে অবহেলা করে কৃত্রিমতা চাপিয়ে দিচ্ছে।

বড়ো বড়ো শহরের দোকানে প্রায়ই দেখা যায় আপাদমস্তক কৃত্রিম সাজসজ্জায় সজ্জিত কিছু কিশোরী-যুবতী বিদেশি পুতুলের মতো সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। এদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে যে মহিলা ক্রেতা দেখলেই কিছু বিশেষ কোম্পানির প্রসাধন সামগ্রী কেনার জন্য তাদের প্ররোচিত করে।

আসলে, চাকুরিরতা মহিলাদের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ওইসব কোম্পানি। তাদের গ্রাহকদের মধ্যে চাকুরিরতা মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। ওই সংখ্যাটা আরও কয়েকগুণ বাড়ানোই তাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তারা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে আমাদের মানসিকতাকে বাইরের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করে। যেমন, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে যে, হাত-পায়ের স্বাভাবিক রোম মেয়েদের সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। সুতরাং কোম্পানিগুলির বক্তব্য তাদের বানানো প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করলে মহিলারা আরও সুন্দর হয়ে উঠবেন। অথচ ওইসব জিনিস একবার ব্যবহার করতে শুরু করলে আর ফেরার রাস্তা থাকে না। ক্রেতা বাধ্য হবেন ওইগুলি কিনতে এবং বিক্রেতা দীর্ঘদিনের জন্য লাভান্বিত হতে থাকবে। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের পারম্পরিক সাজসজ্জায় কয়েকবছর আগে পর্যন্ত ওইসব দ্রব্যের বিশেষ ব্যবহার ছিল না।

গোটা বছর ফর্সা টুক্‌টুকে থাকার জন্য নানারকম প্রসাধনী আমাদের বোকা বানাচ্ছে। একটু ভাবুন তো, আমাদের দেশের জলবায়ুতে মেমসাহেবের মতো ফ্যাকাশে ত্বক হওয়ার তো কথা নয়! —এ শুধু শ্যামলা মেয়েদের মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি করে। কোম্পানিগুলির বানানো প্রসাধনীর তালিকা অন্তহীন— কোনোটা দিয়ে মুখ ধোয়, কোনোটা মেখে বসে থাকে, কোনোটা ঘষতে থাকে, তা সত্ত্বেও ভারতে শ্যামবর্ণা মেয়েদেরই প্রাধান্য। এটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমরা ওইসব জিনিস কিনে বারবার কেন অর্থ অপচয় এবং নিজেদের অপমানিত করতে থাকব?

চুলের যত্ন সম্বন্ধে যত বলা যায় কম হবে। বিজ্ঞাপনে চুল পড়া নিষেধ। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, দিনে ৩০-৪০টা চুল পড়া খুবই স্বাভাবিক। পুরনো চুল পড়বে, তবেই তো নতুন গজাবে? এমনভাবে মডেল চিরুনি দেখে যেন ঝরা চুল গোনাই তাদের জীবনের একমাত্র কাজ। তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, ক্রিম, ফেসওয়াশ ইত্যাদির বিজ্ঞাপনগুলি বেশিরভাগই কম্পিউটারে এডিট করা হয়ে থাকে। বেশ কয়েকবছর আগে হলিউড অভিনেত্রী জুলিয়া রবার্টসের বিজ্ঞাপন-সহ একটি বিশেষ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করলে বয়স বোঝা যায় না এমন দাবি করেছিল একটি কোম্পানি। এডিট করা ছবিটিতে ক্রেতাদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার জন্য আদালতে বিচার হয় এবং কোম্পানিটি দোষী সাব্যস্ত হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল ক্রেতাদের বোকা বানানো যাবে না। প্রসাধন ব্যবহার করে যা হচ্ছে তারই ছবি বিজ্ঞাপনে দিতে হবে। কোনোরকম এডিটিং করা যাবে না। আমাদের দেশে শক্ত আইন না থাকার জন্য আমাদের বোকা বানিয়ে চলেছে ওরা।

একটি বিজ্ঞাপনে মায়ের কালো চুলের রহস্য জানতে চায় তার যুবতী কন্যা। অপরটিতে যুবক পুত্র পাশ্চাত্যের উত্তেজক পোশাক পরিহিতা লাস্যময়ী মাকে প্রশ্ন করে তার যৌবনের রহস্য কী? নিজের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির কাছে মায়ের এ কী রূপ? লজ্জা, লজ্জা! আমাদের 'পাকা মাথার বুদ্ধি' কোথায় গেল? পরিপক্ক বয়সে মাথায় রুপালি ঝিলিক— এতো ব্যক্তিত্বের অপূর্ব প্রকাশ!

প্রকৃতির ঈশ্বরপ্রদত্ত জিনিসকে অস্বীকার করা অন্যায়। তেল-সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে পারি আমরা। ত্বকের সমস্যার সমাধানে দিনে দু'তিন লিটার জল আর শাঁখের গুঁড়ো খুবই ভালো। চুলের জন্য রইল নারকেল তেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামের কালো মেয়েটিকে 'কৃষ্ণকলি' বলে গৌরবান্বিত করেছেন। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি চায় আমাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, অতৃপ্তি বাড়াতে। তবে আমরা তাদের পাতা ফাঁদে পা দেব না। স্বদেশি দ্রব্য, স্বদেশি মানসিকতায় আমরা ওদের বাণিজ্যিক দাবি থেকে অনেক উঁচুতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছি। সে পথ চরম বিকাশের ও পরম শান্তির। সেটাই তো সেরা পাওয়া। যা কোনো বাহ্যিক প্রসাধন দিতে পারে না। ■

শিশুদের রিউম্যাটিক জ্বর, হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রিউম্যাটিক জ্বর ঘটে থাকে এক প্রকার অণুজীবের সংক্রমণের ফলে। যদি রোগ সময়মতো নির্ণয় ও চিকিৎসা করা না হয় তবে হৃদপিণ্ডের প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। এ রোগ সাধারণ বাচ্চাদের (৫-১২ বছর) মধ্যে বেশি হয় কিন্তু চিকিৎসা করালে এর মোকাবিলা করাও খুব কঠিন নয়। তবে অপরিষ্কার পরিবেশে বাস করা বাচ্চাদের মধ্যে এটি খুবই বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত গলার সংক্রমণ থেকে এর উৎপত্তি।

ছোটো বয়সে গলার মধ্যে টনসিলে অনেক রকম সংক্রমণ হয়। এসবের মধ্যে বিটা, হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস নামক অণুজীব এই রোগের প্রধান জীবাণু। গলা ভেঙে যাওয়ার চিকিৎসা যদি দীর্ঘদিন ঠিকমতো না করা হয় তাহলে এই জীবাণুগুলি রক্তের মধ্যে বিস্তার করে হৃদপিণ্ডকে আক্রমণ করে। ফলে খুব জ্বর, কাশি, শরীরে ও গাঁটে ব্যথা হয়। এটা কখনও খুব তীব্র আকার ধারণ করে এবং তখন এই পরিস্থিতিকে রিউম্যাটিক কার্ডাইটিস্ বলে। হৃদপিণ্ডে সংক্রমণের ফলে শিশুদের জ্বর ও কাশি, সঙ্গে পায়ের ও হাতের গাঁট ফুলে ওঠে ও লাল হয়ে যায়, তাতে প্রচণ্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। নাড়ির গতি খুব দ্রুত হওয়ার ফলে শিশুর একটা অস্বস্তি ভাবও প্রবল হয়। অবহেলা করলে এই রোগ জটিল আকার নিতে পারে। এর জন্য হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, তখন জটিল রোগ যেমন মাইট্রাল স্টেনোসিস, অ্যায়োর্টিক ইনকমপিটেন্স, অ্যায়োর্টিক স্টেনোসিস ইত্যাদি নানা প্রকারের জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এই রোগটি শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তবে বয়ঃসন্ধিকালের পরেও হতে পারে। সঠিক চিকিৎসা না হলে এই রোগ হৃদপিণ্ডের চিরস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

কারণ : বিশেষ প্রকার স্ট্রেপটোকক্কাস দ্বারা গলাতে বা টনসিলে সংক্রমণ ও তার সঠিক চিকিৎসার অভাবে এই রোগ হয়। প্রধান কারণ হলো নোংরা ও অত্যন্ত ঘন ও অপরিচ্ছন্ন দূষিত বাসস্থানে বাস করা। কোনও পরিবারের এই রোগের আগে আক্রান্ত হবার ইতিহাস থাকলে বংশগত কারণে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ : গলার সংক্রমণ বা গলা ভাঙা, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ জ্বর ও হাড়ের জোড়া ফোলা ও ব্যথা থাকে।

শরীরে এক বিশেষ প্রকার বড়ো, লালচে, চুলকানিবিহীন ফুসকুড়ি দেখা যায় যার কিনারাগুলো মসৃণ হয় না। কনুই, হাঁটু বা শরীরের অন্যান্য গ্রন্থির প্রধান অংশে এক প্রকার গুটলি দেখা যায়। এগুলি হৃদপিণ্ডের ভেতরেও হতে পারে।

কোরিয়া (হাত ও পায়ের অনৈচ্ছিক নড়াচড়া) সংক্রমণ মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়লেও এই লক্ষণ দেখা দেয়। রিউম্যাটিক জ্বরের কারণ এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণই সিডেনহ্যাম কোরিয়া রোগের উৎস।

রিউম্যাটিক হৃদরোগ দেখা দেয় রিউম্যাটিক জ্বরের পর

কারণ : রিউম্যাটিক জ্বর ও তার ফলে কপাটিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায়। কপাটিকার ছিদ্র সরু হবার জন্য কপাটিকা দিয়ে কখনও রক্ত কম প্রবাহিত হয়, কপাটিকা সঠিকভাবে বন্ধ না হবার ফলে কখনও বা রক্ত উলটো দিকে প্রবাহিত হয়।

লক্ষণ : এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো হৃদপিণ্ডের তর্জন বা মারমার ধ্বনি। রক্ত যখন ক্ষতিগ্রস্ত সরু কপাটিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন এই মারমার ধ্বনি সৃষ্টি হয়। কখনও-বা এই রোগে সঞ্চিত রক্তের ছোটো ছোটো টুকরো হৃদপিণ্ডের উৎপন্ন হওয়া রক্তনালীর ভিতরে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক, বৃক্ক বা চোখের রক্তনালী অবরোধ করে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করে। কোনও কোনও সময়ে শ্বাসকষ্ট, নাড়ি ছন্দপতন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পা ও শরীরে ফুলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও দেখা যায়।

অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স, আর্নিকা অনেক ধরনের ওষুধ থাকলেও শিশুকে এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসা উচিত। লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে উপকার পাওয়া যাবে। ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রিউম্যাটিক জ্বরে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুবই কম। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা খুবই ফলপ্রসূ। □

ভারত এখন চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাজাঞ্চি

আমরা বিশ্বের পঞ্চম শক্তিমান অর্থনীতির দেশ এবং তৃতীয় হওয়া কেবলমাত্রই সময়ের অপেক্ষা। ভারতের স্টকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে স্পর্শ করল। এটাই এখন শিরোনামের খবর।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

করোনা অতিমারীর সময়, একটু ঘুরে তাকাই। তখন যেমন করোনাকে হারানোর লড়াই, ঠিক তার সঙ্গে চলছে দেশের অর্থনীতির হার না মানার যুদ্ধ। বিরোধী সব রাজনৈতিক দল তখন এক একটা অর্থনীতির জ্ঞান খনি। তখন তারা সব পণ্ডিতি সমালোচনায় মগ্ন। তপ্ত শির। দেশ যেন অর্থনীতির অকর্ম আলস্যবেশ ধরলো। ঠিক সে সময়েই একজন মানুষ আচমকাই কবিত্ব কল্পনার ছন্দে বলে উঠেছিলেন— মানুষ যেভাবে ভয় পাচ্ছে, ভারতের অর্থনীতি নিয়ে ততটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এবং বললেন দেশের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। না, তিনি কোনও রাজনৈতিক ক্যাডার নন। তেমন বহুল চর্চিত নাম নন, যতটা চর্চিত অমর্ত্য সেন কিংবা পরমজিত গুহঠাকুরতা। প্রতিমুহূর্তে যারা দেশের রসাতলে যাওয়া হ্যালোসিনেট করেই শিরোনামে থাকেন। সেই আপাত কম চর্চিত ব্যক্তির নাম—কে ভি কামাথ। যিনি ব্রিকস্ সদস্যভুক্ত দেশগুলির নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান। তাঁর কথা তেমন গুরুত্ব পেল না। কিন্তু তাঁর কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলল, কারণ তিনি ভারতের ইউ (U) আকৃতির অর্থনীতির মর্মে ঢুকেছেন। অনুভব করেছেন সংকটেরও তীর মিলবে এবং সব দেশের চেয়ে দ্রুত লয়ে তা মিলবে। তারপর করোনা কাটল। ছন্দ ফিরল। নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে রয়টার্স, বিবিসি থেকে সিএনএন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল মানিটরি ফান্ড— সবাই এক এক করে শিরোনাম করল—

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ভারত।

তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হতে চলেছে ভারত। জিডিপি-তে ধামাকা রাখল ভারত। এক্সপার্ট কখনও চীনকে টেক্কা দিতে তো কখনও ফোরেক্স রিজার্ভে তাক লাগানো গ্রাফে। করোনার পর যেভাবে ঘুরে দাঁড়াল ভারতের অর্থনীতি, তাতে আকৃষ্ট হলো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা। কর্ম ও শ্রমক্ষেত্রের এমন স্বর্ণখনি তারা হাতছাড়া করতে নারাজ। করোনার সুখ-দুঃখের চক্রে গভীর গদ্যমুখর সময়ের পর ভারতের অর্থনীতির মুক্ত অশ্ব যে এমন অভাবে ছুটবে, তা সত্যিই এক বিজয়বাদ্য।

দেশের অর্থনীতির এক বিশেষ সূচক হলো পর্যটন ব্যবসা। বিনিয়োগ, শিল্প, উৎপাদন, রপ্তানি এসব তো আলোচনা হয়েই থাকে। কিন্তু একটা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রগতি কতটা গতিশীল তার সূচক পর্যটন শিল্প। ২০২২-এর পর থেকে কেবল বিনিয়োগেই নয়, পর্যটক আকর্ষণের জাদুঘর হয়েছে ভারত। ২০২১-এর ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বিশ্ব পর্যটন দিবসে পরিসংখ্যা প্রকাশিত হয়, ওই বছর ভারতে আসেন ১৫.২ লক্ষ বিদেশি পর্যটক। যা ২০২২-এ হয় ৬১.৯ লক্ষ। ভারতের সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল উন্নতিতে উৎসাহী আকৃষ্ট বিদেশি পর্যটকরা। এই একটি শিল্প পর্যটন, যা একযোগে সড়ক থেকে হোটেল ব্যবসা, আঞ্চলিক শিল্পকলা থেকে পরিষেবা ক্ষেত্র সর্বত্র প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। করোনা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় পর্যটন শিল্প যে হারে শ্রীবৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অনুমেয় আগামী ২০৩০-এর মধ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে ভারত

সরকারের ফরেক্স আয় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে এবং ২০২৮-এর মধ্যেই এই ক্ষেত্র থেকে ৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব সংগ্রহের আশা করা যাচ্ছে। ভাইব্র্যান্ট ইন্ডিয়ার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে রামমন্দির, কিংবা নেতাজীর গ্রানাইট মূর্তি নির্মাণ থেকে অটল টানেল। ভারত বিশ্বের এই মুহূর্তে পঞ্চম এবং আসন্ন তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে যে দ্রুত অগ্রগামী এবং তা যে ভয় না পাওয়া আশা, তার সূচক পরিসংখ্যানে দৃপ্ত পর্যটন শিল্প।

পরিসংখ্যান ধরে এবার একটু প্রমাণ মেলে ধরার চেষ্টা করি, ভারত যে সত্যিই ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের দেশ হলো। ২০২০-২১-এ যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কল্পনা করা যায়নি তা বাস্তব করছে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষ। অর্থবর্ষ ২৩-এর প্রথম কোয়ার্টারেই ভারত অর্থনৈতিক ভাবে সংযুক্ত রাজ্যকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা আরও ভালো প্রমাণ করা যাবে রিয়েল জিডিপি-র দ্বারা। ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে যা ছিল ৩৭.৪৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার তা এই চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৪০.৩৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার! সফল ভ্যাকসিনেশন এবং কনট্যাক্ট-ইনটেনসিভ-সার্ভিস সেক্টর জনশক্তি মজবুত করার বিরাট সাফল্য ভারত দেখিয়েছে বলেই ট্রিলিয়ন ডলার চুম্বী অর্থনীতির ধ্বজা উড়ছে। ভারত আজ আন্তর্জাতিক বাজারকে হাতছানি দিচ্ছে। ২০২৩-২৪-এ যখন পশ্চিমের দেশগুলোতে সংকট মন্দা, তখন আমাদের জিডিপি (কারেন্ট প্রাইস)-র অঙ্ক ৩০১.৭৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার! এবং এই মুহূর্তে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ ইউনিকর্ন ভ্যালুয়েশন সম্পন্ন দেশ ভারত, ফেব্রুয়ারি (২৩) ভ্যালুতে ছিল ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট চলতি আর্থিক বর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে হ্রাস পেয়ে হলো ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত আর্থিক বর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই চিত্র যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্য প্রবল ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় সূচক। একটা যদি উদাহরণ দিই, চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারেই পিই-ভিসি বিনিয়োগে ভারত দেখল ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এমন ছবি সত্যিই কি আগে ভাবা যেত? ভারতের ওপর প্রতিটা উন্নত দেশ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। রপ্তানিকারক দেশ হিসেবেও যে বিপুল পরিমাণ লক্ষ্মীলাভ করছে ভারত নিশ্চিতভাবেই ঈর্ষণীয়। গত সেপ্টেম্বরের ব্যবসায়িক রপ্তানির অঙ্ক যেখানে ছিল ৩৪.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা এক বছরের মধ্যেই হলো ২১১.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! শুধু বিনিয়োগ কিংবা শিল্প উৎপাদন হিসেবে নয় কৃষিক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি প্রদর্শন করল ভারত। ২০২৩-২৪ (মে)-এ গম ও ধান সংগ্রহ (সেন্ট্রাল পুল) যেখানে যথাক্রমে ছিল ২৬২ এবং ৩৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, তা বৃদ্ধি পেয়ে হলো যথাক্রমে ৩১২ এবং ২৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

ভারত সরকারের একাধিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দেশ হয়ে উঠছে আরও সবল ও স্বাবলম্বী। যেমন, ৬ আগস্ট ২০২৩, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ১৩০৯টি রেল স্টেশনকে উন্নত আধুনিক করার সঙ্কল্প নেয়। আত্মনির্ভর ভারত, লোকাল গো'জ গ্লোবাল, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্মার্ট সিটি, স্মার্ট অ্যাপ (ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম), মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর নর্থ ইস্ট রিলিজিয়ন (২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে ১৫০০ কোটি টাকার ফাইনান্সিয়াল আউট লে) থেকে শুরু করে ২০২২-এর স্পেশাল ফুড প্রসেসিং ফান্ড (২০০০ কোটি টাকা), এমন আরও অসংখ্য সাফল্য এবং সংগঠিত পদক্ষেপের মাঝেই ২০২২-এ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঘোষণা— ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেটেলমেন্টে রুপি (টাকা) গ্রহণযোগ্য হবে। তারই মাঝে জুন ২০২২-এ উত্তরপ্রদেশে ৮০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ক্রমবর্ধমান স্পেশাল ইকনমিক জোন থেকে তেজস হোক কিংবা চন্দ্রযান— এক একটা এবং প্রতিটাই প্রমাণ দেয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে প্রগতিশীল এবং শক্ত হচ্ছে। এই তেজস রূপী অর্থনৈতিক পরিবর্তন তেজ সাফল্য বলিষ্ঠতা ২০১৮-র পর থেকে চোখে পড়েছে এবং তা পূর্ণ প্রমাণ পেল করোনা সংকট কাটানোর পরেই।

করোনার পরে গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স একদমে ঘোষণা করে ভারত সবচাইতে সম্ভাবনাময় ও ক্রমবিকাশী অর্থনীতির দেশ। ২০৩০-এর মধ্যেই ভারতের নমিন্যাল জিডিপি হতে পারে ৭.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার!

আমাদের বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে ইউরোপের দেশগুলো অনেক সময়ই মশকরা করে। কিন্তু করোনার পর এই বিপুল জনসংখ্যাই ভারতকে ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের দেশ বানাতে সাহায্য করছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ যদি ভারত হয়, তাহলে তো অন্য সব কনজিউমারেও ভারত শীর্ষে। স্বাভাবিকভাবেই তাই বিনিয়োগ, উৎপাদন, লেন-দেন সবটাই ধামাকা দেখাবে। এই বছরে ২৫ আগস্ট ডি কে শ্রীবাস্তব তার India–towards becoming the third largest economy in the world শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন, বড়োজোর ২০২৮ সালে ভারত অর্থনৈতিক ভাবে জাপান ও জার্মানিকেও টেক্কা দেবে। এবং প্রবল সম্ভাবনা যে সেই বছরই ভারতের জিডিপি হবে ৫.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অতিক্রম করবে জাপানের দেশের জিডিপি (৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)-কেও। অঙ্ক কত কষব? অর্থনীতির অঙ্ক কি আর সাধারণ পাটীগণিত? আমরা শুধু বুঝি অনেকটা উন্নতি করলে তবেই ভারতকে নিয়ে Goldman Sachs (৬ জুলাই, ২০২৩) প্রকাশ করে 'The world's economy by 2075'।

আমরা এতদূর নাই-বা ভাবলাম। সত্যিই ২০৭৫ অনেক দূর। কিন্তু ২০৩০ তো এল বলে। ইতিমধ্যেই আমরা বিশ্বের পঞ্চম শক্তিমান অর্থনীতির দেশ এবং তৃতীয় হওয়া কেবলমাত্রই সময়ের অপেক্ষা। ভারতের স্টকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে স্পর্শ করল। খবর এবং শিরোনামের খবর। কিন্তু এই খবরের মধ্যে এক নিবিড় আত্মনির্ভরতার প্রমোদ প্রলাপ নিবিষ্ট। জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে ভারত তার কোরক যেন এই সংবাদে আবদ্ধ। অর্থনীতির তীর্থ পর্যটন কেন্দ্র হবে ভারত। সেই মহাক্ষণের বার্তা দিল ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি। বিরোধীরা এখনও নিদ্রাঘোরে, তাই এখনও এই ৪ ট্রিলিয়ন ডলার অঙ্ককে সাফল্য বলতে পারছেন না। পরিশেষে বলব 'পরাহত তর্কযুক্তি, বাহুবল করে নত শির...' —খাজাঞ্চির খাতা যে ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের হিসেবে ভেলকি দেখাল। ■

চার ট্রিলিয়ন অর্থনীতির মাইলফলকের মাধ্যম আমূল অর্থনৈতিক সংস্কার

সুদীপ্ত গুহ

২০১৪-তে যখন মোদীজী প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের হাল ধরলেন, দেশ তখন বেশ কিছু বড়ো সংকটের সম্মুখীন ছিল। অধিকাংশ পণ্য চীন থেকে আমদানি হতো। জ্বালানি, ভোজ্য তেল, ভেষজ উপাদান, সামরিক সরঞ্জাম থেকে ওষুধের পেমেন্ট সিস্টেম-সহ এমন কিছু ব্যাপারে আমরা পরনির্ভর ছিলাম যে আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতি, শিক্ষানীতি তো বটেই, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে দশবার ভাবতে হতো। কোনো ইসলামি দেশ থেকে যদি কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলা করতো, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেবার আগে আমাদের বহুবার ভাবতে হতো, বাকি ইসলামি দেশগুলোর প্রতিক্রিয়া কী হবে। এভাবে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়া কোনো দেশের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর নাও হই, কম করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিগুলি যেন কোনো না কোনো ক্ষেত্রে আমাদের উপর নির্ভরশীল থাকে। নইলে ভূরাজনীতিতে বিশ্বের ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ উপেক্ষিত থেকেই যাবে।

কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধাও ছিল বিস্তর। আমাদের উন্নয়নের পথে অন্যতম বড়ো যে বাধা ছিল তা হলো দেশের অধিকাংশ গরিব মানুষ ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা। এর ফলে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ জীবনবিমা, দুর্ঘটনাবিমা, কৃষিবিমা, চিকিৎসাবিমা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষি বা ক্ষুদ্র ব্যবসার মূলধনের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হতো মহাজনদের ওপর যা এককথায় মধ্যযুগীয়। পরিকাঠামো উন্নয়ন ছিল দিশাহীন। সড়কপথ, জলপথ, আকাশপথ, রেলপথকে কীভাবে একটা সংযুক্ত শিল্প এবং বাণিজ্য তথা রপ্তানি করিডোরে পরিণত করা যায়, সেই দিশা ছিল না। উচ্চমানের শিক্ষা শুধুমাত্র ধনীদের জন্য বরাদ্দ ছিল। দেশের যুবকদের কিছু বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন সফটওয়্যার এবং কিছু পরিষেবা ছাড়া কোনো কাজের সুযোগ ছিল না। পণ্য আমদানি খাতে দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রচুর বিদেশি মুদ্রা। ব্যাপারটা এমন যে একটা গ্রামের যুবক-যুবতীরা যে বিষয় নিয়েই পড়াশোনা করুন বা যে কাজেই দক্ষতা অর্জন করুন না কেন, ঘরগেরস্থালি করা ছাড়া সেই গ্রামে আর কোনো জীবিকা নেই। এমন এক পরনির্ভর দেশ কীভাবে উন্নতি করবে? এমন অবস্থায় শুরু হলো বিভিন্ন কঠোর আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার। আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির জন্য শুরু

হলো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দেশের মধ্যে পরিকাঠামোর উন্নতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

প্রথমে ভাবা যাক আন্তর্জাতিক কূটনীতি। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্ব হারাতে থাকলো WTO তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, যাদের দৌলতে চীন-সহ বিভিন্ন দেশ বেশ কিছু সুবিধা পেত। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কিংবা এবং কখনো ছোটো ছোটো গ্রুপ তৈরি শুরু করে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর হলো। QUAD (আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত), I2U2 (ইজরায়েল, ভারত, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি), BRICS (ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা), সাংহাই কোপারেশন অর্গানাইজেশন (চীন, রাশিয়া-সহ কিছু দেশ) থেকে জি-২০ সব গ্রুপেরই সদস্য হয় ভারত। সবাই ভারতকে তাদের সদস্য হিসেবে চাইছে। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, ইরান কিংবা ইউরোপ সবাই চাইছে মোদীজীর ভারতকে। কিন্তু কেন? ইরান চাইছে মোদীজীর বন্ধুত্ব আবার ইজরায়েলও চাইছে। রাশিয়া মোদীজীর হাত ধরতে চায়, আবার আমেরিকাও। তুরস্ক বিপদে ভারতের সাহায্য চায়, আবার চায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ভারতের সহযোগিতা চায় তাঁদের পরিকাঠামো নির্মাণে। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ চায় ভারত তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় ওই দেশের খনি থেকে লিথিয়াম তুলে দিতে সাহায্য করুক। ভারতের তৈরি অস্ত্র কিনে নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার মজবুত করছে বহু দেশ। মাস্টার, ভিসা কার্ডের বদলে রুপে কার্ড চাইছে বহুদেশ, SWIFT-এর বদলে UPI পেমেন্ট সিস্টেম চাইছে তারা। বাঁচাতে চাইছে মাস্টার, ভিসা কার্ড এবং সুইফট-এর কমিশন। কোভিডের সময়ে মার্কিন ভ্যাকসিন না নিয়ে ভারতীয় ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে একশোর বেশি দেশ। মোদীজীর পায়ে হাত দিয়ে পর্যন্ত প্রণাম করেছেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান।

কিন্তু দশ বছরে পালটে গেল আমাদের দেশ? কী কী বিশেষ পদক্ষেপ দেশকে পৃথিবীর পাঁচ নম্বর অর্থব্যবস্থায় নিয়ে এল? আমাদের উপর শাসন করা ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও কীভাবে আমাদের থেকে পিছিয়ে গেল? কেন পৃথিবীর বড়ো বড়ো আর্থিক সংস্থা বলছে যে জার্মানি ও জাপানকে ছাড়িয়ে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র? এক এক করে আলোচনা করা যাক।

(১) দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। মোদীজী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে এঁদের দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। দেশের দরিদ্রতম মানুষ প্রথমবার জানলো জীবনবিমা, দুর্ঘটনাবিমা, চিকিৎসা বিমা, কৃষিবিমা কী। ব্যাংকিং সার্ভিসের মধ্যে আসায় কম হারের সুদে ধার পেলেন তারা। সঙ্গে রুপে ডেবিট কার্ড, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। বাড়লো ব্যাংকের মূলধন। রুপে কার্ড প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দিল মাস্টারকার্ড এবং ভিসা কার্ডকে যারা অতিরিক্ত কমিশন নেয় আজও। SWIFT-এর বদলে আনা হলো UPI। আগেই বলেছি, বিশ্বের বহু দেশ এই UPI ব্যবহার করছে আজ। ডিজিটাল লেন-দেন বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে যাওয়া সহজ হলো। বাড়লো ব্যাংকের ক্যাপিটাল। আরও কম সুদে দেশবাসী পেতে থাকলো শিল্প, বাণিজ্য, বাড়ি ও গাড়ির লোন। চাঙ্গা হলো দেশের অর্থনীতি।

(২) কর্পোরেট কর কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুরের থেকেও কমিয়ে দেওয়া হলো, যাতে চীন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা না থাকে চীনের বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এবং তারা ভারতে ব্যবসা করার ব্যাপারে দু'বার না ভাবে।

(৩) বাড়ানো হলো ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার। সড়কপথ, জলপথ, রেলপথ, পণ্য পরিবহণ রেলপথ, নতুন বিমানবন্দর এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক বন্দর তৈরি হলো রপ্তানির পরিকাঠামোকে আরও সহজ করতে। সাবমেরিনের জন্য কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে মহাকাশ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলো যাতে মানুষ আরও কম পয়সায় আরও বেশি ডাটা ব্যবহার করতে পারে। রেলের ইলেকট্রিফিকেশন বাড়লো বহুগুণ। ইন্টারনেট ডাটার দাম কমিয়ে ১০০ ভাগের এক ভাগ করা হলো। রিনিউয়েবল্ এনার্জির পরিমাণ বাড়লো। দেশের প্রতিটি জেলাকে প্রতিটি বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন পরিকাঠামোর মাধ্যমে, যাতে আমদানি/রপ্তানির মাধ্যমে বাড়ানো যায় বাণিজ্য ও কাজের সুযোগ। ইন্টারনেটে ডাটার দাম মাত্র কয়েক বছরে ১ শতাংশ হয়ে গেল। আজ মণিপুর, লাদাখ বা কোচবিহারের গ্রামের একটি ছেলে নিজের বাড়িতে বসে IIT, NEET কিংবা সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি নিতে পারে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোটা, হায়দরাবাদ বা দিল্লি যেতে হবে না।

(৪) কালো টাকার অর্থনীতি প্রায় নির্মূল। নোটবন্দি, জিএসটি এবং রেরা আইনের ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজ ক্যাশে ব্যবসা না করে তাঁদের সঠিক ব্যবসার অঙ্ক দেখাচ্ছেন। রেরা আইন আবাসনে নগদ লেন-দেন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে, বহু নেতা বেনামে জমি-বাড়ি কিনে ভেবেছিলেন তারা রক্ষা পাবেন। কিন্তু তাঁদের স্থান হয়েছে শ্রীঘরে। মুম্বই, দিল্লির বড়ো বড়ো আবাসন কোম্পানি একসময় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ নগদে ফ্ল্যাট কিনতে বাধ্য করতেন সাধারণ সৎ নাগরিককেও। আজ তাঁদের বড়ো অংশ হয় জেলে আছেন, নয় জামিনে। এদিকে আবাসন শিল্পে বিক্রি বেড়েছে বহুগুণ। কারণ সৎ মানুষের নাগালে এসেছে আবাসন।

(৫) আইবিসি ২০১৬ : গত দশ বছরের সবচেয়ে বড়ো সংস্কার এই ইনসলভেন্সি

আর্থিক সংস্কার

গত বছর আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির হার বৃহত্তম আর্থিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ, মুদ্রাস্ফীতি ৭৫ বছরে প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার মজুতে রেকর্ড, রপ্তানি সর্বকালীন রেকর্ড, ব্যাংকের লাভ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে প্রথমবার এবং ব্যাংকের এনপিএ নিম্নগামী। ৪ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির গণ্ডি পেরিয়েছে ভারত। কিন্তু পুরো অঙ্কই তো ডলারে? আমাদের নিজস্ব মুদ্রায় আসল বৃদ্ধির হার কত? অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় কত? একবার হিসেব করা যাক—

২০১৪-র মে মাসে ভারতের জিডিপি ছিল ২ ট্রিলিয়ন ডলার, ২০২৩-এ ৪ ট্রিলিয়ন ডলার।

অ্যান্ড ব্যাংক্রাপসি কোড, ২০১৬। ১৯৬৯-তে ব্যাংক জাতীয়করণ করেন ইন্দিরা গান্ধী, কিন্তু ব্যাংকের হাতে টাকা আদায়ের অস্ত্র তুলে দেননি তিনি। ফলে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা ধার নিয়ে টাকা ফেরত দিত না রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে। প্রতিবাদ করেন তৎকালীন জনসঙ্ঘের সাংসদ অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং স্বতন্ত্র পার্টির সাংসদ মিনু মাসানিজী। অটলজী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০০২-এ সারফাইসি আইন আনেন। কিন্তু অটলজী ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর আবার নেতাদের ফোনে লোন এবং লোন মকুবের খেলা শুরু হয়। ব্যাংকের লোন বড়ো ব্যবসায়ী শোধ না করলে, রিজার্ভ ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকের সেই ক্ষতি পূরণ করতো। এর কেতাবি নাম রিক্যাপিটালাইজেশন। অথচ সাধারণ মানুষ গৃহঋণের কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে, তার বাড়ির চাবি নিয়ে নিত ব্যাংক। এই পদ্ধতিতে বাড়তো জিনিসের দাম।

আমরা ভাবতাম সরকারি ব্যাংকে আমাদের টাকা সুরক্ষিত। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আমাদের পকেট থেকে ব্যাংকের এই ক্ষতি মিটিয়ে দিত। এবার মোদীজী আনলেন আইবিসি কোড। তিন মাস ব্যাংকের টাকা বাকি থাকলে শিল্পপতির সব সম্পত্তি বেচে সেই টাকা উশুল করবে ব্যাংক। এর পরেই দেখা গেল স্বাধীনতার পর প্রথমবার দেশ থেকে পালালো দেশের তিন বড়ো শিল্পপতি। অনিল আম্বানি, রুইয়ারা বাধ্য হয় তাঁদের সম্পত্তি বেচে টাকা ফেরত দিতে। কারণ জুগারের দিন শেষ। কমেছে ব্যাংকের এনপিএ। গত বছর দেশের সব ব্যাংকের মিলিত লাভ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আরও বেশি ঋণ পাচ্ছে গরিব কৃষক, মৎস্যজীবী, হস্তশিল্পী থেকে ছোটো ব্যবসায়ী। আগে এই দরিদ্র শ্রেণী চড়া সুদে বন্ধকের বিনিময়ে মূলধন নিত মহাজনদের থেকে।

(৬) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ : ২০১৩-তে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ছিল দুই অঙ্কে। ইন্দিরা গান্ধী ব্যাংক জাতীয়করণ করার কয়েক বছরের মধ্যে এই হার প্রায় ৩০ শতাংশ হয়েছিল। এর প্রভাব কী? ধরা যাক, জানুয়ারিতে আপনি জানেন আপনার ব্যাংকে ১০০০০ টাকা আছে, কিন্তু ডিসেম্বরে এই টাকার মূল্য কমে দাঁড়ালো প্রায় ৭৭০০ টাকার সমান। অর্থাৎ আপনার পকেট থেকে ২৩০০ টাকা বেরিয়ে গেল, অথচ আপনি জানতে পারলেন না। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি বরাবর পশ্চিমি দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনগুণ ছিল। স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে প্রথমবার আমাদের ছড়িয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কীভাবে? রিজার্ভ ব্যাংকের মানটরি পলিসি বিষয়ক কমিটি প্রতি তিন মাসে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে রেপো রেট ঠিক করে। অতিমারির সময়ে পৃথিবীর কিছু দেশ সুদের হার প্রায় শূন্যের কাছে নিয়ে গেলেও ভারত সেই রাস্তায় যায়নি। বিভিন্ন বামপন্থী নোবেল লরিয়েটের পরামর্শ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে সমস্যার সমাধানে। একমাত্র কৌটিল্যের দেশ ভারত সেই রাস্তায় পা দেয়নি।

এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের ফল আমরা কী পেলাম

২০১৪-তে এক ডলারের দাম ছিল ৫৮.৫৫ এবং এখন ৮৩। ডলারের এই দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস হাওয়ায় আমাদের কিছু করার নেই। আন্তর্জাতিক স্তরে সব দেশেরই মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং এই অবমূল্যায়নের হার অন্যান্য মুদ্রার থেকে ভারতের অনেক কম। কিন্তু যদি ডলারের দাম একই থাকতো, তাহলে আমাদের জিডিপি হতো ৫.৬৭ ট্রিলিয়ন। অর্থাৎ শুধু ভারতীয় মুদ্রায় হিসেব করলে আমাদের জিডিপি ১২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর পিপিপি হারে? অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার নিরিখে? পিপিপি হারে ২০১৪-তে এক ডলারের দাম ছিল ১৭ এবং এখনো ২৩। এই হারে হিসেব করলে ভারতের জিডিপি ১১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। কোভিড সবকিছু লণ্ডভণ্ড করার পরেও। এক কথায় চূড়ান্ত সাফল্য। সঠিক পরিকল্পনা, দেশের প্রতি ভালোবাসা, সঠিক কূটনৈতিক অবস্থান এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি বলছে, ভারত কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর তৃতীয় অর্থশক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু তাঁদের একটু সংশোধন করতে হবে। ভারত চীনকেও ছাড়িয়ে যাবে। চীনের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন চীনের জিডিপি বাড়িয়ে দেখানো আছে। বর্তমানে চীনের আবাসন ক্ষেত্রে বড়ো ধস নেমেছে এবং ডুবেছে বেশ কিছু ব্যাংক, যে খবর বাইরে আসছে না। সঙ্গে কমছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ। ডুবতে চলেছে তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রকল্প। তার মধ্যে চলছে তাইওয়ান দখলের পরিকল্পনা। যাকে বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। তাই বলি, ভারত দ্বিতীয় স্থানে আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আগে থাকবে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ততদিন থাকবে যতদিন গায়ের জোরে ডলার আধিপত্য ধরে রাখবে তারা। কবির স্বপ্ন সত্য করে সেই দিন আসবে যখন 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

ফঃ ৪

তাই কোভিড পরবর্তী দুনিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে একমাত্র ভারত।

(৭) উপরোক্ত বিভিন্ন সংস্কারের ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মূল গন্তব্য হয় ভারত। চীন তো বটেই, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণে পাল্লা দিচ্ছে আমাদের দেশ। জিএসটি চালু হওয়ায় সোজা হয়ে গেছে ব্যবসা। একসময় দেড় ডজন অপ্রত্যক্ষ কর ছিল আমাদের দেশে। মুম্বই থেকে সিঙ্গাপুর ব্যবসা করার চেয়ে মুম্বই থেকে কলকাতা ব্যবসা করা ছিল কঠিন। সরল অভিবাসন নীতি, নতুন লেবার কোড, জিএসটি, কর্পোরেট কর হ্রাস, বিভিন্ন রাজ্যে এক জানালার সুব্যবস্থা বিদেশিদের কাছে বিনিয়োগ সহজ করে দিয়েছে।

(৮) খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানি তেলের অভাব আমাদের দেশে। অথচ ১৪০ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজন শক্তি। শুধু আরব দেশের উপর নির্ভর হলে ভূ-রাজনীতিতে আসবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। মোদীজী আলাদা ভাবে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি করেন। রাশিয়া, ইরান ও ভেনেজুয়েলার থেকে তেল নেন আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্দর তৈরির চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় বিভিন্ন জলপথে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি করতে এবং ভারতীয় নৌসেনাকে শক্তিশালী করতে।

(৯) ভারত আজ পৃথিবীর ঔষধালয়। যাত্রা শুরু করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজী। ১৯৯৯ সালে। তখন এইচআইভি-র প্রকোপে আফ্রিকা ছিল মৃত্যুপুরী। কম দামে ভারতীয় সিআইপিএলএ কোম্পানিকে দিয়ে ওষুধ তৈরি করিয়ে মার্কিন ওষুধের ১ শতাংশ দামে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পাঠানো শুরু করেন। বাঁচান সেই দেশগুলির মানুষ ও অর্থনীতিকে। পরের দশ বছর ভারতের জেনেরিক ওষুধ সারা বিশ্বে আরও জনপ্রিয় হয়।, এমন অবস্থায় বিশ্বের বড়ো বড়ো ওষুধ কোম্পানিগুলি ভারতের পেটেন্ট আইন পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া শুরু করে। কিন্তু পাশে দাঁড়ায় একশোর বেশি সেই দেশ যারা ভারতের এই 'জীবনের অধিকার'কে অগ্রাধিকার দেবার নীতিতে লাভবান হয়েছে। সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কিছু আধিকারিক এবং বিভিন্ন এনজিও ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারতের ওষুধ কূটনীতির সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ কোভিড অতিমারীর সময় যখন ভারতীয় ভ্যাকসিন বাঁচিয়ে দেয় পৃথিবীর ১৬০টি দেশকে। সরকারের উপর বিরোধীদের চাপ আসে মার্কিন ফাইজার কোম্পানির ভ্যাকসিন কেনার জন্য। কিন্তু পরে দেখা যায় ফাইজার ভ্যাকসিন কার্যকর নয়। বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানায় ভারতকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

(১০) কৃষি ব্যবস্থা : ষাটের দশকের মাঝামাঝি সবুজ বিপ্লব হলেও, তার ফল পায় মাত্র আড়াইটা রাজ্য, যারা ২০২১-এ কৃষি বিল আটকে দিল। বাকি রাজ্যের বাস্তবতা ছিল চাষিদের আত্মহত্যা। অধিকাংশ চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টই ছিল না। কৃষি বিমা এতদিন তাহলে কাদের জন্য দিয়েছে সরকার? শুধু বড়ো চাষি? ছোটো চাষিদের তাহলে মূলধন আসতো কোথা থেকে? হয় বড়ো চাষি, নয় মহাজন। সবুজ বিপ্লবের বহু আগে পশ্চিমবঙ্গের দুটি সেচ প্রকল্প শেষ হয়। ওই সময়ের আরও একটি। কিন্তু বাকি প্রকল্প কেন শুরু হলো না? এই অবস্থা সারা দেশেই। তাই শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা। চালু হয় প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প, যাতে কৃষককে চাষের মূলধন দিয়ে সাহায্য করা যায়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে এই মূলধন, বাজার, সেচের জল এবং বিমার অভাবে হাজার হাজার একর জমি ফেলে চাষিরা কাশ্মীর থেকে মিজোরামে চাষ করতে যাচ্ছেন।

গত দশ বছরে, দেশের কৃষির এই উন্নতির ফলে বেড়েছে কৃষি রপ্তানি। ভোজ্য তেলের জন্য আমাদের মালয়েশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীলতা কমছে ধীরে ধীরে। কিন্তু কৃষিতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল হিমঘরের অপ্রতুলতা। ইসিএ বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের ভয়ে হিমঘরে বিনিয়োগ করতে সাহস পেত না বিনিয়োগকারীরা। চাষিরা নির্ভর করতেন দেশের বৃহত্তম ঘুঘুর বাসা তথা এপিএমসি বাজারের উপর। চাষিদের বাঁচাতে আনা হয় কৃষিবিল, যা আটকে দেয় বামপন্থী মিডিয়া এবং খালিস্তানি কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীদের সমর্থন পুষ্ট কৃষি আন্দোলন। সেই মুহূর্তে পিছিয়ে আসে সরকার। কিন্তু বিকল্প পথ বের করে দেশের বাকি রাজ্যের চাষিদের জন্য। এই বছর ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের প্রতিটি ব্লকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০০০ টন সংরক্ষণ ক্ষমতার হিমঘর বানানো হবে, যার জন্য খরচ হবে এক লক্ষ কোটি। বাড়বে কৃষি রপ্তানি। ওষুধের মতো বিশ্বের খাদ্যভাণ্ডারে পরিণত হবে আমাদের দেশ।

(১১) এর মধ্যে আরও একটা ভালো খবর এসেছে বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে। গত ১৯ নভেম্বর ভারত সরকার ২০টি খনি নিলাম করেছে যেখানে লিথিয়াম-সহ বেশ কিছু জরুরি মৃত্তিকা পাওয়া যাবে। আগামী দিনে তেলের বিকল্প হিসেবে এই ধরনের ধাতু ভীষণ জরুরি। ইলেকট্রিক গাড়ি, মোবাইল, এলইডি বাতি থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

(১২) মোদীজীর দেশবাসীকে আরও একটি বৈপ্লবিক উচ্চপ্রযুক্তিযুক্ত উপহার OCEN তথা Open Credit Enablement Network। এই ব্যবস্থা মূলত দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প তথা MSME ক্ষেত্রে মূলধনের ব্যবস্থার জন্য। OCEN-এর অবদান দেশের জিডিপিতে ৩০ শতাংশ এবং রপ্তানিতে ৪৮ শতাংশ। কিন্তু ৮০ শতাংশ MSME সরকারি ঋণ থেকে বঞ্চিত এবং একটি খবর সূত্রে মোট ক্রেডিট গ্যাপ ৮৮০ ট্রিলিয়ন। বন্ধকের (collateral) অভাব এবং CIBIL স্কোর না থাকায় ব্যাংকের পক্ষেও ঋণ দেবার ঝুঁকি নিয়ে ভাবতে হয়।

এই অবস্থায় মোদীজী আনলেন OCEN ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক OCEN সংস্থার সব তথ্য থাকবে এই নেটওয়ার্কে। তারা লোনের জন্য অনলাইন দরখাস্ত করবে এবং লোনদাতা ব্যাংক তাদের ইতিহাস তথা IT (ইনকাম ট্যাক্স) রিটার্ন, ব্যালান্স শিট ইত্যাদি দেখে তাদের লোনের পরিমাণ এবং সুদের হার প্রস্তাব করবে। MSME সংস্থা তার সুবিধামতো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে। এই ব্যবস্থা দেশের MSME ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে আগামীদিনে। ■

৪ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি ও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) কুণাল ভট্টাচার্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও জার্মানির পরে ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ভারতের জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) প্রথমবার ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করার সঙ্গে ভারতের এই ঐতিহাসিক মাইল ফলক অর্জনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও শিল্পপতি এই কৃতিত্বে আপ্লুত হয়েছেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন। এর সঙ্গে মনে হচ্ছে যে দেশটি ২০২৫ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এক ধাপ এগিয়েছে।

দ্য ইকোনমিক টাইমস্ এবং আইএমএফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে ভারতকে গড়ে ৯.১ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের চিহ্নে পৌঁছতে হলে এবং তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে আরও ২ বছর লেগে যেতে পারে। বৈশ্বিক জিডিপি-র পরিপ্রেক্ষিতে জাপানকে (৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি) ও জার্মানিকে (৪.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি) ছাড়িয়ে যেতে হবে। প্রাক্তন আর.বি.আই গভর্নর ডি. সুব্বারাও বলেছেন, ভারত শুধুমাত্র ২০২৮-'২৯ সালের মধে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে এবং এই স্বপ্ন অর্জনের জন্য যে ৮টি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে তাও তালিকাভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ফলাফলের উন্নতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবণতা অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নতি।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর ভারতের অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কে প্রেস

ইনফরমেশন ব্যুরোর একটি সাম্প্রতিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বেতন-বহির্ভূত রাজস্ব ব্যয়— ২০২২-'২৩ আর্থিক বছরের বাজেট সংস্থান অনুযায়ী ৬২,৪৩১ কোটি টাকা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে হয়েছে ৯০,০০০ কোটি টাকা, যা ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। উপরন্তু, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্ট বলছে, ১.৪ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা প্রকল্প শুরু করতে প্রস্তুত ভারত, যার মধ্যে ৯৭টি তেজস মার্ক-১এ যুদ্ধবিমান রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৫৫,০০০ কোটি টাকা।

ভারতের ডলার থেকে ক্রয় ক্ষমতা সমতায় (Purchasing Power Parity বা PPP) রূপান্তর অনুপাত হলো ৩.৫— চীনের (১.৭) তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। উদাহরণ: যদি কোনো ব্যক্তি এক মার্কিন ডলার দিয়ে তার দেশে একটি বার্গার কিনতে পারে, ভারতে সেই ব্যক্তি ৩.৫টি বার্গার এবং চীনে ১.৭টি বার্গার কিনতে পারবে। ভারতের মাথাপিছু জিডিপি G20 দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন— ২০২৩ সালে নমিনাল জিডিপি-র হিসেবের পরিপ্রেক্ষিতে ২,৬১২ ডলার এবং PPP শর্তাবলী অনুযায়ী ৯,১৮৩ ডলার। উভয় ক্ষেত্রেই চীনের মাথাপিছু জিডিপি ২৩,৩৮২ ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জিডিপি ৮০,০৩৫ ডলার (PPP হিসেবে)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতীয় প্রতিরক্ষা নির্মাতাদের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত মানের সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন, এবং এটিকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্বশর্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। গত ২৯ নভেম্বর, ২০২৩-এ নয়াদিল্লিতে 'প্রতিরক্ষা পণ্যে স্বনির্ভরতার জন্য গুণমান ওডিসি' থিমের ওপর ডি.আর.ডি.ও কোয়ালিটি কনক্লেভের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ভাষণে তিনি বলেন, কেবলমাত্র উচ্চমানসম্পন্ন পণ্যই বিশ্বব্যাপী চাহিদা তৈরি করে। ভারতকে একটি গ্লোবাল ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং হাব এবং একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোদীজীর দৃষ্টিভঙ্গী সফল হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে সেই

দেশগুলি, যারা উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে, তাদের সরঞ্জামগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। তিনি আরও বলেন, ভালো মানের কারণে এসব উৎপাদন প্ল্যাটফর্মজাত পণ্যের দাম বেশ চড়া; তবে এটি মনে রাখা উচিত যে আমদানিকারক দেশগুলি অত্যাধুনিক পণ্যগুলির জন্য সর্বোচ্চ মূল্য দিতেও প্রস্তুত। তিনি উচ্চমানের সামরিক ব্যবস্থা তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন যা হবে কার্যকর, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের মিশনগুলি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে করে তুলবে সক্ষম।

আগামী ৫ বছরে ৩৫,০০০ কোটি টাকার (৫ বিলিয়ন ডলার) সামরিক হার্ডওয়্যার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ভারত। ২০১৯ সালে ৪২টি দেশে প্রতিরক্ষা পণ্য রপ্তানি করে বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারকদের তালিকায় ১৯তম স্থানে ছিল ভারত। বর্তমানে ভারত ৭৫টিরও বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করছে। এই রপ্তানির অঙ্ক ২০২২-'২৩ সালে ১৫,৯২০ কোটি টাকায় (১.৯৪ বিলিয়ন ডলার) দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রথম দেশীয় বিমানবাহী জাহাজ (এয়ারক্র্যাফট্ ক্যারিয়ার) আই.এন.এস বিক্রান্তকে প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কোচিন শিপইয়ার্ড থেকে জাতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। 'আত্মনির্ভর ভারত' -এর পথে এটি একটি বড়ো মাইলফলক। এটির নির্মাণে ৭৬ শতাংশ দেশীয় সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ভারতের গর্ব।

কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ২০২৪-'২৫ সালের মধ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি.আর.ডি.ও) ভারতে বিকশিত স্ট্র্যাটেজিক ও ট্যাকটিকাল অস্ত্র ব্যবস্থা (weapon system), প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ৪৩০টি পণ্যের বিস্তৃত সম্ভার প্রদর্শন করেছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লেজার-গাইডেড অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল (ATGM) সফলভাবে মেইন ব্যাট্‌ল ট্যাঙ্ক (MBT) 'অর্জুন' থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে। মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৬৮টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই) ভিত্তিক প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ৪০টি এ.আই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন, দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনী উন্নতির লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর, ২০২১-এ কেন্দ্রীয় সরকার ৪১টি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে (OFB) পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা উদ্যোগে (PSU) পরিণত করেছে। ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট, ২০২৩ অনুসারে, ভারত এফ.ডি.আই-পাওয়ার হাউজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ২০২১-'২২ সালে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ বিদেশী বিনিয়োগ সংগ্রহের নজির গড়েছে। বিগত ১০ বছরে (এপ্রিল, ২০১৪— জুন, ২০২৩) মোট প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা এফ.ডি.আই প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৬১৪.০২ বিলিয়ন ডলার। এই এফ.ডি.আই এসেছে ১০১টিরও বেশি দেশ থেকে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে সম্ভাবনাময় দেশীয় সামরিক হার্ডওয়্যার শিল্পকে পর্যাপ্ত উৎপাদনের সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ১০১টি প্রতিরক্ষা সামগ্রী (আর্টিলারি বন্দুক ও অ্যাসল্ট রাইফেল সহ অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র) আমদানি নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাখার পরিকল্পনা করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অনুমান করছে যে ২০২৫-২০২৭ সালের মধ্যে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প ক্ষেত্রের প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকার (৫৭.২ বিলিয়ন ডলার) বরাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদন বা ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিঙের বিকাশের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের অধীনে 'ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যান্ড এক্সপোর্ট প্রোমোশন পলিসি, ২০২০' প্রণয়ন করেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা আমদানি ২০১১-২০১৫ সময়কালে মোট চাহিদার ১৪ শতাংশ ছিল। ২০১৬-২০২০ সালের মধ্যে এটি ৯.৫ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ আমদানি প্রায় ৩৩ শতাংশ কমেছে।

ভারত তার আই.টি বা তথ্য-প্রযুক্তি এবং সফ্‌টওয়্যার শিল্পের বিকাশের সাফল্যের অনুরূপে একটি সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র (Cyber Security Hub) রূপে আবির্ভূত হয়েছে। সুপ্রশিক্ষিত আই.টি কর্মীবাহিনী এবং প্রতিষ্ঠিত আউটসোর্সিং পরিকাঠামোর সঙ্গে অনেকগুলি কোম্পানি তাদের বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা কেন্দ্রগুলিকে ভারতে স্থানান্তরিত করছে। এই উন্নতিশীল প্রবণতা— সম্পদ সমূহের সহজলভ্যতা, ব্যয়-কার্যকারীতা ও গুণমান দ্বারা পরিচালিত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের আই.টি (Information Technology) ল্যান্ডস্কেপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে নোট বাতিল ও কোভিড পরবর্তী আর্থিক লেন-দেন ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তর, পাশপোর্ট এবং রেল ও বিমানের টিকিট সংরক্ষণের মতো সরকারি পরিষেবাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে দেশীয় তথ্য- প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করেছে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম— আমাজন, ফ্লিপকার্ট, বিগ বাস্কেট, সুইগি ও জোমাটোর মতো খাদ্য ও পণ্য সরবরাহ পরিষেবা, উবের ও ওলার মতো রাইড- শেয়ারিং অ্যাপস্ এবং UPI-এর মতো ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমগুলি দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, এটি পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণা, প্রযুক্তিগত আক্রমণ (সাইবার অ্যাটাক)— সামাজিক প্রকৌশলগত স্ক্যাম-সহ একাধিক সাইবার অপরাধের জন্ম দিয়েছে। ড্রোন শিল্প ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন সম্ভাবনাকে ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে সাহায্য করতে পারে। ড্রোনগুলি বায়বীয় তাপ নিরীক্ষণ, বায়বীয় দৃশ্যমানতা সমীক্ষা, নির্মাণ পর্যবেক্ষণ, নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নজরদারি, ই-কমার্স প্রেরিত পণ্য ডেলিভারি, গুদামজাত সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সামরিক অনুসন্ধান বা Reconnaissance Mission, পরিক্রমণরত যুদ্ধাস্ত্র (loitering munitions) এবং টার্গেট ড্রোন হিসেবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মোচন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ভারতকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উৎপাদন, অপারেশনস্ এবং ড্রোন রপ্তানির একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত করা।

সন্তকথা ঃ অন্নদা ঠাকুর

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

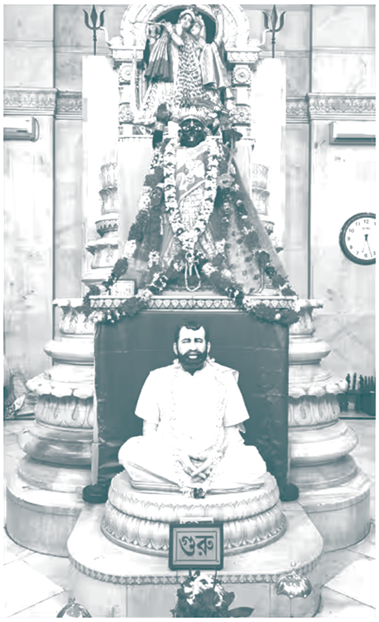

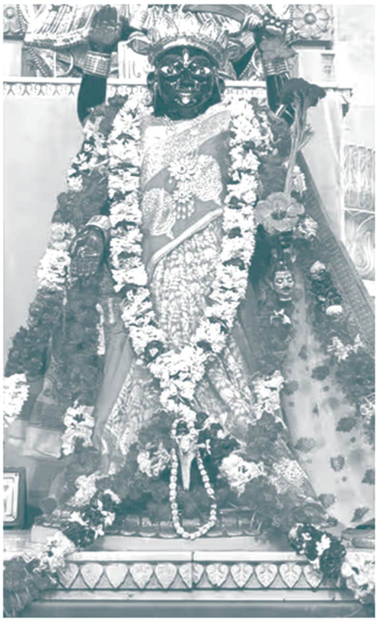

কল্যাণ গৌতম

মাতৃসাধক অন্নদা ঠাকুর গণেশ দেউস্করের লেখা 'ঝাঁন্সীর রাণী' বইটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। আদ্যামায়ের পূজা যেমন করেছেন, মাতৃজাতির প্রতিও ছিল চিরকালীন সম্মান। অবলা, অত্যাচারিতা, নিপীড়িতা, পতিতা, রক্ষিতা মেয়েদের প্রতি ছিল অপার করুণা এবং স্নেহ। তাদের দুঃখ ঘোচানোর জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। কাশীতে থাকাকালীন প্রায় ১৮-১৯ জন দরিদ্র কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। পণ প্রথার বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে স্বাধীনতা হারিয়ে হিন্দু যেদিন পাঠানের পদানত হলো, আর্যাবর্তে সেদিন থেকে নিরাকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। সেই সময় থেকেই আমাদের অধঃপতন শুরু।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদ্যামায়ের উপাসক অন্নদা ঠাকুর চাক্ষুষ করেননি কোনোদিন (১৮৮৬ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ), কিন্তু তিনি ভাবরাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা স্বপ্নাদেশের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। স্বপ্নেই তাঁর দীক্ষালাভ ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষভাগে, আনুমানিক নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কার্তিকের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার এক নদীনালা বেষ্টিত গ্রামে দরিদ্র ও ধর্মপ্রাণ পরিবারে অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য বা অন্নদা ঠাকুরের জন্ম। পিতা অভয়াচরণ ভট্টাচার্য এবং মাতা তিলোত্তমা দেবী। অন্নদার তিন ভাই এবং দুই বোন। তিনি পিতা-মাতার মধ্যম সন্তান। জানা যায়, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যাম এবং বোনেদের নাম যথাক্রমে নীরদা ও প্রিয়দা। তাঁর পিতামহ ছিলেন পুণ্যশ্লোক, সদাশিব, দাতা ও পরোপকারী। তাঁদের গ্রামের বাড়ির পিছনে ছিল ছোটো নদী, আরও দক্ষিণে গিয়ে তা বড়ো নদীতে পড়েছে। গৃহ পরিসরে ছিল নানান গাছপালা, তুলসীমঞ্চ, কলাগাছ, তেঁতুলগাছ ইত্যাদি— সাজানো গোছানো; বাড়ির সম্মুখে পূর্ব দিকে একটি পুকুর। অন্নদার মা মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত ছিলেন। বাড়িতেই ছিল দশভুজা ঘর।

মা স্বপ্নে নানান ওষুধ পেতেন এবং তা দিয়ে পাড়া-পড়শিদের নানান দুর্ঘটনা ও রোগসমস্যায় তিনি তাদের সাধ্যমতো চিকিৎসা করতেন। জানা যায়, দেড় বছর বয়সে অন্নদা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং দৈব ওষুধে নিরাময় ঘটে। ৫-৬ বছর বয়সে তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেন। তাঁর প্রথম পাঠ্য বই ছিল 'বর্ণবোধ'। ১৩-১৪ বছর বয়সে তিনি চট্টগ্রামের কাছে কক্সবাজারের সাগরে সাম্পানে চড়ে যাবার সময় একটি চলন্ত স্টিমারের তরঙ্গে ও তুফানে প্রায় নৌকাডুবির মতো অবস্থা হয় এবং দৈবক্রমে তিনি তা থেকে রক্ষা পান। অন্নদার বাড়ি থেকে ৭-৮ ক্রোশ দূরে হাওলা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি কালাচাঁদ ঠাকুর , যেখানে হত্যে দিয়ে অপুত্রা সন্তানলাভ করতেন বলে খ্যাতি ছিল।

আনুমানিক ২০ বছর বয়সে কাশীধাম থেকে কলকাতায় এলেন অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসের জন্য। ইচ্ছে কবিরাজ হবেন। মা তিলোত্তমার আশীর্বাদ ও অনুমতি মিললো। কিন্তু কলকাতার প্রায় ৫০ জন কবিরাজের

কাছে যাতায়াত করেও পড়ার কোনো সুবিধা হলো না। অবশেষে কুমারটুলি নিবাসী কবিরাজ হেমরত্ন সেন এবং বিডন স্ট্রিটের কবিরাজ বিরজাচরণ কবিরত্নের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে বৃত্তি পরীক্ষায় বসলেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আর্থিক সাশ্রয় ঘটলো, তাঁর পক্ষে অধ্যায়ন সম্ভব হলো, কাউকে খোসামোদ করতে হলো না। ঝামাপুকুরে মহারাজ দিগম্বর মিত্রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপরিতলে স্থাপিত নবনির্মিত আয়ুর্বেদিক কলেজে তিনি ভর্তি হলেন। সেই গৃহে বিনামূল্যে স্থানলাভ হলো এবং বৃত্তির টাকায় ফ্রি বোর্ডিঙে দুইবেলা খাবার বন্দোবস্তও হলো। এখানে দেড় বছর অবস্থান করলেন, পরে পটলডাঙ্গায় কবিরাজ শরচ্চন্দ্র সাংখ্যতীর্থের বাড়িতে বছর খানেক ছিলেন।

এরপর তিনি ১০০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁর বন্ধু যতীন্দ্র নাথ বসু ও তাঁর ভাই শচীনের আগ্রহে তাদের গৃহ সিদ্ধেশ্বর ভবনে স্ব পাক ভক্ষণ করে আরও ২/৩ বছর কাটান এবং এরমধ্যে তাঁর আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি লাভ হয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় ২৫ বছর। আয়ুর্বেদ পড়তে পড়তে তাঁর মা ভীষণ রোগাক্রান্ত হলেন। সেই সময় রোগশয্যায় মাতৃআজ্ঞায় জন্মমাস চতুর্থ রবিতে অন্নদার বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন অন্নদার বয়স প্রায় ২২-২৩ এবং সহধর্মিণী মণিকুন্তলা দেবীর বয়স ১৪-১৫ বছর। মণিকুন্তলাদেবী পরে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী রূপে পূজিতা হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ পড়াকালীন তিনি কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট ধরে চলতে গিয়ে এক সন্ধ্যায় চারটি মেয়ের মাথায় করে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া কালীমূর্তি দর্শন করেন এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করে ভাবোন্মাদ হলেন। তখন তিনি যতীন-শচীনদের গৃহে অবস্থান করছেন। সেই সময় ৮-১০ দিন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলে তিনি সেই পরিবারের অকুণ্ঠ সেবাযত্ন পেয়েছিলেন। পরে তাঁর পিতা খবর পেয়ে মাসাধিক কালের জন্য চট্টগ্রাম নিয়ে যান। তখন গৃহে আগত বহু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এরপর স্বাভাবিক হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। আয়ুর্বেদ পড়াকালীনই ভাবোন্মাদ অবস্থার পূর্বে তিনি ১৯১৩ সালে কলকাতায় ডি. এল. রায়ের সঙ্গে দেখা করে পণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী (নাটক ও গান) প্রদর্শন করেন ও বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন 'ভীষ্ম' নাটক লিখছেন। তিনি কথা দেন, এরপর পণপ্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তিনিও একটি নাটক লিখবেন। কিন্তু তার কিছু পরেই তিনি অকাল প্রয়াত হন।

কবিরাজ আগেই হয়েছেন। এবার শুরু হলো কবিরাজি ব্যবসায়ের উদ্যোগ। বন্ধুপিতা সিদ্ধেশ্বর বসু ৫-৬ টি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদিক ওযুধ তৈরির জন্য দুই হাজার টাকা দিলেন এবং সহকারী হিসেবে মধ্যমপুত্র যতীন্দ্রনাথ বসুকে জুড়ে দিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কর্ণধার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। তিনি ও তাঁর ম্যানেজারের পরামর্শে ও সহায়তায় ওযুধ তৈরির যাবতীয় বন্দোবস্ত হলো। কারখানা ও করণের নাম দিলেন পিতার নামে, 'অভয়া সুধা কার্যালয়'। বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর হ্যান্ডবিল ছাপানো হলো। অফিসে আলো, আসবাব, আলমারি এল। লোকজন, এজেন্ট, ক্যানভাসার, বড়ো বড়ো প্ল্যাকার্ড সবই হলো। কিন্তু কোথায় কী!

অন্নদার আয়ুর্বেদ ব্যবসা শুরু হলো না। তিনি বাসন্তী পূজার মধ্যে স্বপ্নাদেশ পেলেন রামনবমীর দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি পাকুড় ও নারকেল গাছের সংযোগস্থলের তলায় পুকুরের ভেতর থেকে আদ্যামায়ের মূর্তি উদ্ধার করতে হবে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, পুলিশি ধরপাকড় এড়িয়ে তা উদ্ধার করা হলো। শচীনের বাড়িতে সন্তর্পণে রাখা হলো। কলকাতার মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। হিতবাদী, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় আদ্যামায়ের প্রতিমূর্তি-সহ ঘটনা সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হলো। সেদিন রাতেই মায়ের ফের স্বপ্নাদেশ হয় বিজয়া দশমীর দিন মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। ভক্তদের মধ্যে প্রবল দোলাচল। অবশেষে আদেশ মতো পঞ্চানন ঘোষ লেনের ফোটোগ্রাফার বলাই মিত্রকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে রাখা হলো। এই ছবির আদলেই পরে আদ্যাপীঠ মন্দিরের জন্য আদ্যামায়ের মূর্তি নির্মিত হয়।

এরপর অন্নদা ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহে নানান প্রয়াস করলেন। এমনকী কেন্দুবিল্বের ব্রাহ্মণসভায় গেলেন, গেলেন কাশীধামে। পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাশীতে মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা বন্ধ হলো। এদিকে চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য প্রদত্ত টাকার জোগানদাতা সিদ্ধেশ্বর বসুর সঙ্গে তর্কবিতর্ক হলে, তিনি তাদের বাড়ি ছেড়ে ১৫ নম্বর বৃন্দাবন মল্লিক লেনে ভূপেনবাবুর মেসের একতলার ঠাণ্ডা ঘরে চলে এলেন। চলতে থাকলো তাঁর 'স্বপ্নজীবন', শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বারেবারে স্বপ্নযোগ ও তাঁর নির্দেশ পালন। অন্নদা ঠাকুরের লেখা গ্রন্থ 'স্বপ্নজীবন'-এ সেই অলৌকিক জীবনের কথা সরলভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে সাধুজীবনের বহু অপ্রকাশ্য গুহ্য রহস্য তিনি প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তা ভক্তজীবনে ভগবানের অপূর্ব লীলার পরিচায়ক। স্বপ্নাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যে কথোপকথন হয় তা 'রামকৃষ্ণ মনঃ শিক্ষা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩২৫ বঙ্গাব্দ বা ১৯১৮-১৯ সাল নাগাদ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে স্বপ্নে সন্ন্যাস দীক্ষা পান বলে জানা যায়। এরপর তিনি এক বছর পিতৃ-মাতৃ সেবা করেন; পরের একবছর সস্ত্রীক সাধনা। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তির দিন সমাপ্ত হলো সেই সাধনা। উদ্‌যাপিত হলো পুরশ্চরণ ব্রত, যা আদ্যাপীঠের প্রথম সিদ্ধোৎসব।

মন্দির নির্মাণের আদেশপ্রাপ্তি হয় এক ঝুলন পূর্ণিমার দিন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯২৬-২৭ সালে আদিষ্ট মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি জমি ক্রয় করে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তাঁর অনুগামী ও ভক্তবৃন্দের হাত ধরে আদ্যামায়ের বিগ্রহ উদ্ধারের পর সলতে পাকানো হতে থাকে আদ্যাপীঠ গড়ে উঠার পর্ব। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৮ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার একবছর পর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি পুরীধামে দেহরক্ষা করেন। পরে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে মন্দির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। সাত দফায় সকল কাজ সমাপ্ত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের মকর সংক্রান্তিতে ১৯৬৭ সালে। আদ্যাপীঠের আদিষ্ট মন্দিরে দেবী কালিকা আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে পূজিতা। মন্দিরের অন্তর্ভাগে ওঙ্কারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় দেবী আদ্যার মূর্তি, পদতলে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানরত মূর্তি, দেবীর শীর্ষে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপিত, অর্থাৎ নীচ থেকে শুরু করে গুরু, জ্ঞান ও কর্ম এবং প্রেম। আদ্যাপীঠ মঠের অবস্থান প্রায় ২৭ বিঘা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। মন্দিরের আনুষঙ্গিক কাজ রয়েছে আদর্শ জননী ও আদর্শ গৃহিণী নির্মাণের জন্য বালিকাশ্রম প্রতিষ্ঠা, বালকদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম হিসেবে বালকাশ্রম প্রতিষ্ঠা, বাণপ্রস্থাশ্রম ও দাতব্যচিকিৎসালয় পরিচালনা ইত্যাদি। □

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মহান চিত্রশিল্পী

যামিনী রায়

দীপক খাঁ

কেবল ভারতবর্ষই নয় সারা বিশ্বজুড়ে যামিনী রায়ের শিল্পীর খ্যাতি সমাদর। তাঁর অসংখ্য চিত্র সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের শিল্পরসিকরা। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১১ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। বাবা রামতারণ রায়। মা নগেন্দ্রবালা। ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল রামতারণের। পালাপার্বণ উপলক্ষ্যে আলপনা, ছবি নিজেই আঁকতেন রঙের গুঁড়ো দিয়ে। পুত্র যামিনী উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার এই শিল্প প্রতিভা পেয়েছিলেন। সেইকালে ছবি আঁকা পেশা হিসেবে খুব আশাপ্রদ ছিল না। তা সত্ত্বেও ছেলের শিল্পপ্রীতি ও প্রবণতা লক্ষ্য করে এক সময় যামিনীকে ছবি আঁকা শেখানোর জন্য কলকাতায় মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা আর্টস্কুলে ভর্তি হলেন। আর্টস্কুলে গিলার্ডি সাহেবের কাছে যামিনী পাশ্চাত্য রীতির অঙ্কন পদ্ধতি ও তেল রং আঁকা শিখতে লাগলেন এবং অচিরেই দক্ষ হয়ে উঠলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রজীবনেই যামিনী রায় তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার স্বরূপ একটি গিনি পেলেন।

এই বয়সেই ইউরোপীয় প্রথায় তিনি ছবি দেখে কিংবা কোনও মডেল সামনে বসিয়ে তখন প্রতিকৃতি আঁকতেন যে তা জীবন্ত বলে মনে হতো। এই দক্ষতার জন্য শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে জাতশিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পীসত্তা সৃষ্টির অতৃপ্তিতে একদিন তাঁর অঙ্কন পদ্ধতির পরিবর্তন করলেন। ফলে আমরা পেলাম একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক চিত্রশিল্পীকে।

প্রতিকৃতি অঙ্কন যামিনীকে অর্থ যশ দিচ্ছে। কিন্তু একজন প্রতিভাবান শিল্পীর এর মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ কতটুকু? এই বোধোদয় যখন হলো তখন তিনি চৌত্রিশ বছরের। নিশ্চিত অর্থকরী পথ বন্ধ করে পা বাড়ালেন অনিশ্চয়তার পথে। জীবনের এই সময়টা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে।

সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হয়েছে। কখনো ছাপাখানার কাজ নিতে হয়েছে, কখনো বসেছেন কাপড়ের দোকানে। এত করেও সংকুলান হচ্ছিল না। অনেক দিন স্বামী-স্ত্রীকে আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। নতুন পথের সন্ধান করতে বসে কিছুদিন ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকলেন।

কিন্তু তাতে মন ভরলো না। কোথায় যেন একটা শূন্যতা থেকে যাচ্ছে। স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি নতুন পথের সন্ধানে বাঙ্গলার লোকসমাজে চিরপ্রবহমান লোকশিল্পের ধারাটিকেই একসময় নিজস্ব পথরূপে বেছে নিল। এই সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রেখাঙ্কনের সহজ কৌশলটি রপ্ত করে নেন। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। কলকাতায় এসে জুটেছে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্য। এই সৈনিকদের মধ্যে চিত্ররসিক অনেকেই যামিনী রায়ের ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। তারা দেশে ফেরার সময় স্মারক হিসেবে কিনে নিয়ে গেলেন তাঁর অনেক ছবি। এভাবে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যামিনী পৌঁছে গেলেন বিদেশেও। এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, সাহেবদের প্রশংসা না পেলে এ দেশের মানুষ স্বদেশি কোনো বিষয়ে আগ্রহী হন না। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্রের প্রমুখ প্রতিভার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছে। বিদেশে খ্যাতিলাভ করার পর যামিনী রায়ের ছবির ব্যাপারে এদেশের চিত্ররসিকদের নিস্পৃহতা দূর হলো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বি. নিকোলসের 'ভার্ডিক্ট অন ইন্ডিয়া' বইটির কথা।

এই বইটিই যামিনী রায়কে বিশ্বখ্যাতি লাভে সহায়তা করেছে বেশি। ১৯৪১-এ যামিনী রায়ের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তখনও শিল্পী বাগবাজারের ভাড়া বাড়িতে থাকেন। একদিন সকালে বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেন উঠোনের তক্তাপোশে বসে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পীকে অবাক করে কবি হেসে বলেন, 'তোমার ছবি দেখব বলে চলে এলাম।'

ভারতীয় চিত্রকলার তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৫ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মান প্রদান করেন। আপাত দৃষ্টিতে নেহাৎই গ্রাম্যরীতির ছবি বা কালীঘাটের পটুয়াদের পটের ছোঁয়াযুক্ত ছবি মনে হলেও এদেশের বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করল যামিনী রায়ে ছবি। বিশিষ্ট বিদগ্ধ কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'যামিনী রায়ের এসব ছবি চিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেও তীব্রভাবে নাটকীয়, মানবিকতায় ধনী এবং চরিত্রের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সূচিমুখ।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে অনেক লোক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যামিনীও সপরিবারে চলে গিয়েছিলেন বাঁকুড়ায় নিজের গ্রামে। অনেকদিন পরে গ্রামের মানুষদের সান্নিধ্য শিল্পীকে নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত করে তুলল। তিনি প্রাণ খুলে আগে যাঁদের সঙ্গে মিশতেন, সেই কুমোর, কামার, জেলে, তাঁতি, কৃষক, ছুতোর, বাউল তাঁরা এক নতুন রূপ নিয়ে তাঁর মনে ধরা দিল। মনের মতো করে সাজিয়েছেন সেই বাড়ি। নীচুতলায় হয়েছে স্টুডিয়ো ও আর্ট গ্যালারি। দোতলায় বসবাসের ব্যবস্থা। নিজের আঁকা ছবির সঙ্গে সংগ্রহ করা নানা ছাঁদের পুতুল দিয়ে সাজানো হলো ছবির রাখার ঘর। যামিনী রায়ের ছবির প্রধান সম্পদ সহজ সরলতা। রঙে, রেখায়, অলংকরণের বৈচিত্র্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে এই সরলতা। তাঁর রেখাচিত্রের শ্রেষ্ঠ নির্দশন দুই বেড়াল— চিংড়ি মুখে বিড়াল, কালো বিড়াল প্রভৃতি।

সারা জীবনে হাজার দশেক ছবি এঁকেছেন শিল্পী যামিনী রায়। যেমন কৃষ্ণ-বলরাম, গণেশজননী, যশোদা, বুদ্ধদেব, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রাধা-কৃষ্ণ, স্ত্রীলোক, সাঁওতাল রমণী, মায়ের কোলে শিশু, হাতির পিঠে রাজা, লাল ঘোড়া, বাংলার বধূ, গোরু, দুই বৈষ্ণব, তিন যোদ্ধার চিত্র, রথের ওপর রাজারানি, বাছুর, চিংড়ি মুখে দুই বেড়াল, বাউল, সাঁওতালের মাথা প্রভৃতি।

অবশ্য কেউ কেউ যামিনী রায়ের এত প্রতিপত্তি মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে যামিনী রায়ের নিজস্ব নতুন ধারা শিল্পের কোনো ভাবনাকেই প্রকাশ করেনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুপ্রভা দেবীর পুত্র, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য আচার্য নন্দলালের সহপাঠী ও লক্ষ্ণৌ সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অমিতকুমার হালদারের ভাবনা সেই পথেই চলে ''...যামিনীবাবুর মতো এক-একজন শিল্পী অনায়াসে নকলনবিশির দ্বারা অভ্যাস করে যেগুলির এক একটি ধারা চালাবার চেষ্টা করতে পারেন এবং তাতে হয়তো সবাইকে হকচকিয়ে দিতে পারেন। তাতে হয়তো ছবির সংখ্যাও বেশি করে আঁকার সুবিধা আছে, কেননা উপরোক্ত যে কোনো একটি প্রাচীন চিত্রকলার রীতি আয়ত্ত করে নিলেই সে ধরনের হুহু করে আঁকা চলতে পারে না ভেবেচিন্তে। কিন্তু আর্ট কি এই সহজ পথে আছে? ...এই আট-রঙা তাস ('গঞ্জাপা') ও পট এখনও পুরীর মেয়েরা এঁকে থাকেন এবং এদের শিল্পকলায় যে ঐতিহ্যের আবহাওয়া বইছে তার সৌকুমার্যের ছায়াও যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পে আমরা পাই না।''

যামিনী রায়ের মহাপ্রয়াণের (১৯৭২) পর ভারত সরকার ১৯৭৬ -এর ডিসেম্বরে চারজন ভারতীয় শিল্পীর শিল্পকর্মকে 'জাতীয় সম্পদ' বলে গ্রহণ করে। ভারত সরকারের বৈধ অনুমতি ছাড়া এই চারজনের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় ও অমৃতা শেরগিল) শিল্পকর্ম দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীতে আরও তিনজনের নাম যুক্ত হয়। এঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র ঠাকুর ও শৈলজ মুখোপাধ্যায়।

১৯৭৮-এর ২৩ মার্চ ভারত সরকারের ডাকবিভাগ রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, অমৃতা শেরগিল ও শৈলজ মুখোপাধ্যায়— এই চারজনের আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ক ছবি নিয়ে চারটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। যামিনী রায়ের আঁকা 'দুই নারী' ডাকটিকিটে মুদ্রিত হয়— দাম ২৫ পয়সা।

কিন্তু যামিনী রায় ও তাঁর শিল্পকৃতিত্বের ওপরে নির্মম প্রহার করে নেতিবাচক সমালোচনা অসিতকুমার হালদার ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ তাঁরই মাতামহীর ভাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আঁকা ছবির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যামিনী রায়ের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রমাণ শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ২৫.৫.১৯৪১-এর এই চিঠিটি।

''কল্যাণীয়েষু, এখন আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড়ো আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র নিঃশংসয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে একথা আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কিছু দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্য তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়।...আমার সৌভাগ্য, এই বিদায় নেবার আগেই নানা সংশয় ও অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের এই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না। এর জন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক।'' □

রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ দেখে এলাম

ডা. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

গত অক্টোবর মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ উত্তরপ্রদেশ সফরে বেরিয়েছিলাম। গন্তব্য ছিল বারাণসী, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ। উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য স্থান ও জিনিসের সঙ্গে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী মোদীজী কর্তৃক উদ্বোধিত কাশী বিশ্বনাথ করিডর, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ কাজ দেখার। তবে মূল আকর্ষণ ছিল অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ কাজ দেখা এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের আবেগ বোঝা। আসলে কিছুদিন আগে আমার বাসস্থান বোলপুরে সঙ্ঘের প্রভাত শাখায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা শচীন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে কথা হয়। তিনিই অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ কাজ দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রন জানান। তিনি বলেছিলেন তৈরি হলে তো দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসবে, প্রচণ্ড ভিড়ও হবে, তাই পারলে আগে গিয়ে সব দেখে ও জেনে আসতে পারেন। আর বলেছিলেন গেলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তিনি সব দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। সেই কথা অনুসারেই বেরিয়ে পড়েছিলাম এবং কাশী বিশ্বনাথ ও সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করে ৪ অক্টোবর প্রয়াগরাজ হয়ে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা করি। অযোধ্যায় পৌঁছতে রাত ৯টা বেজে গেল। তার উপর চারিদিকে রাস্তাঘাটের কাজ চলায় পুলিশের নির্দেশে ঘুরে ফিরে আমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট সরকারি অতিথিশালায় পৌঁছলাম রাত সাড়ে দশটায়। পরদিন সকালে শচীনদাকে ফোন করে জানলাম উনি রাজস্থানে আছেন। কিন্তু আমরা অযোধ্যায় গিয়েছি শুনে উনি আমাদের অবস্থান জেনে বললেন আপনারা করসেবকপুরমে চলে আসুন, সেখান থেকে সমগ্র নির্মাণকাজ পরিচালিত হচ্ছে, আমি ওখানে বলে দিচ্ছি। আমরা একটি অটোরিক্সা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম।

করসেবকপুরম এখন পুরোপুরি নিরাপত্তা রক্ষী দ্বারা বেষ্টিত। গেটে নেমে পরিচয় দেওয়াতে তাদের ৪/৫ জন সামনে এলেন এবং শচীনদার নাম বলাতে তারা আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। তিনি ওখানে শচীনজী নামে পরিচিত। সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হলো। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের বিতর্কিত ধাঁচা ধংসের ঘটনা থেকে শুরু করে রামমন্দির নির্মাণ কাজের নানা কথা আলোচনা হলো। চা পান করে তাদের ঠিক করে দেওয়া অটো রিক্সায় আমরা অযোধ্যা দেখতে বেরোলাম। সেই অটো রিক্সার মালিক প্রভুদত্ত তেওয়ারীও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী এবং বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংসের দিন করসেবক রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমে আমাদের নিয়ে গেলেন রামলালার পূজার স্থানে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অফিস থেকে আমাদের দলের চারজনের জন্য রামলালার মন্দিরে প্রবেশ, পূজা ও আরতি দেখা এবং ভোগ পাবার জন্য ফ্রি ভিআইপি পাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রায় ৬ জায়গায় নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম। সেখানে রামলালার পূজা ও আরতি দেখলাম এবং পায়েসান্ন প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করলাম। এটি রামলালার অস্থায়ী পূজাস্থান। প্রধানমন্ত্রী আগামী ২২ জানুয়ারি এই বিগ্রহকে মূল মন্দিরে স্থাপন করবেন। সেখান থেকে নির্মীয়মান রামমন্দির প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু কাছে যাওয়া বা ছবি তোলা সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ। ক্যামেরা অবশ্য আগেই জমা রাখতে হয়েছে। সেখানে অনেক আইবি-র লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইরকম একজনের সঙ্গে আলাপ হলো এবং অনেক গল্প হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে একটি দুর্গামন্দিরে দুপুরের খাওয়া হিসেবে ভোগ পেলাম। এরপর অটোচালক আমাদের অযোধ্যার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখালো যার মধ্যে প্রধান হলো রাজা দশরথ প্রাসাদ, রাম-সীতার আবাসস্থল, শ্রীরাম সংসার ত্যাগের সময় যেখানে হনুমানকে বসিয়ে রেখে যান অযোধ্যা পাহারা দেবার জন্য সেই হনুমানগড়ী প্রভৃতি। এ ছাড়া প্রচুর রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মন্দির দেখলাম। গোটা অযোধ্যা জুড়েই এই রকম অসংখ্য মন্দির। আমাদের

ফঃ ৫

মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ২০২৩-এর ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪-এর ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যক্রম

অযোধ্যা ধামে শ্রীরামমন্দির প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক অভিযান।

পুজো করা অর্ঘ্য চাল, নিমন্ত্রণ পত্র এবং শ্রীরামের ছবি এই তিনটি উপকরণ নিয়ে প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে সম্পর্ক করতে হবে।

২২ জানুয়ারি, ২০২৪

- দুপুর ১১টা থেকে অপরাহ্ন ২টো পর্যন্ত নিজের গ্রাম, পাড়া, শহর বা আবাসনের মধ্যে অবস্থিত কোনো মন্দিরে সকল রামভক্ত একত্রিত হয়ে ভজন কীর্তন করতে হবে।
- বড়ো পর্দায় অযোধ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব দেখবেন।
- শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি করতে হবে, প্রসাদ বিতরণ করবেন।
- সব মন্দিরে অবস্থিত দেবী দেবতার ভজন-কীর্তন-আরতি-পুজো করতে হবে।
- 'শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম' এই বিজয় মহামন্ত্র ১০৮ বার সবাই মিলে জপ করতে হবে।
- হনুমান চাল্লীশা, সুন্দরকাণ্ড, রামরক্ষা স্তোত্র, বিভিন্ন ধরনের ভক্তিমূলক গ্রন্থ সকলে একসঙ্গে পাঠ করতে পারেন।
- মন্দির সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন।
- নিজের নিজের বাড়ি সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন, যেমন বিভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে এবং ঝকঝকে চোখের পড়ার মতো বিভিন্নভাবে সাজাতে পারেন।
- নিজের এলাকার সকল হিন্দু বাড়িতে গেরুয়া পতাকা লাগাতে পারেন।
- যদি সম্ভব হয় ওই দিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উপোস থাকতে পারেন।
- যদি সম্ভব হয় কিছু প্রসাদের আয়োজন করতে পারেন।
- সূর্যাস্তের পর নিজের বাড়ির সামনে দেবতাদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য প্রদীপ জ্বালাবেন, প্রদীপের আলোর মালা সাজাবেন, দীপোৎসব পালন করবেন।

প্রথম থেকে প্রস্তুতি

- নিজের নিজের এলাকায় প্রতিদিন প্রভাতফেরী করে সমাজে এরজন্য পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
- প্রতিটি মন্দির সমিতি, পূজারির সঙ্গে বৈঠক করে ২২ তারিখের প্রস্তুতিতে বেশি করে সমাজে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পারেন।
- কার্যক্রমে জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন পথের লোকেদের যুক্ত করবেন। এই কার্যক্রম সমস্ত হিন্দু সমাজের এই ভাবনা সবার মধ্যে হওয়া চাই।
- কার্যক্রমে মা-বোন, বালক-বালিকা,যুবক-যুবতী, কৃষক-কর্মচারী-ব্যবসায়ী, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাইকে যুক্ত করতে হবে।
- এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই প্রত্যাশা।
- এই কার্যক্রম নির্দিষ্ট হিন্দু সমাজের কোনো গোষ্ঠীর কার্যক্রম নয়, বরং সমগ্র হিন্দু সমাজের কার্যক্রমে পরিণত করতে হবে।

অটোচালক শুধু এইসব দেখাচ্ছেন তাই নয়, সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করছেন। আর দেখলাম দেশ বিদেশ থেকে নানা রঙের ও মাপের পাথর যেগুলির উপর নানা শিল্পকাজ খোদাই করে এক স্থানে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পাথরে নম্বর দেওয়া আছে যাতে মূল মন্দিরের গায়ে সহজেই সেট করা যায়। সেইসব পাথর ঘষা মাজা চলছে। সঙ্গে দেখলাম পাথরের অসংখ্য মূর্তি, রামের জন্ম থেকে স্বর্গ আরোহণ পর্যন্ত, যেগুলি মূল মন্দিরের গায়ে স্থাপিত হবে। অনেকটা আমেদাবাদ বা দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরের মতো। অসমের একজন বাঙালি শিল্পী প্রদীপ মণ্ডল এই সব মূর্তির স্রষ্টা। সঙ্গে তার দলবল। এইসব ঘুরে ঘুরে দেখতে খুবই ভালো লাগছিল। সন্ধ্যাবেলায় গেলাম সরযূ নদীর তীরে আরতি দেখতে। যেতে যেতেও তেওয়ারিজী অনেক গল্প শোনালেন। তাঁর কাছেই শুনলাম মন্দির উদ্বোধনের দিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে অযোধ্যায় আগত সমস্ত মানুষকেই অন্নভোগ পরিবেশন করা হবে যার সংখ্যা হবে প্রায় ৭০ লক্ষ । সেদিন মোদীজীও উপস্থিত থাকবেন। প্রভু দত্ত আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার জন্য।

সমগ্র অযোধ্যা জুড়েই পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজ দেখলাম। শহরের অদূরে গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সঙ্গে পুরনো দুই লাইনের রেলস্টেশনের জায়গায় আটলাইন যুক্ত বিরাট রেলস্টেশন যেখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগীজীর ব্যবস্থাপনায় সমস্ত ট্রেনের স্টপেজ নির্দিষ্ট হয়েছে। চলেছে বড়ো বড়ো রাস্তা নির্মাণ, উড়ালপুল, আন্ডারপাস প্রভৃতি। ২০টি বড়ো কোম্পানিকে আধুনিক হোটেল নির্মাণের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে, সেই কাজও চলছে। এক কথায় গোটা অযোধ্যা শহর পালটে যাচ্ছে এবং একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেশের মানচিত্রে স্থান পেতে চলেছে। খুব ভালো স্মৃতি নিয়ে দুদিনের অযোধ্যা ভ্রমণ শেষ করে আমরা লক্ষ্ণৌয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। মনে রয়ে গেল এক বিশাল কর্মযজ্ঞের স্মৃতি। মন্দির উদ্বোধনের পরে দেশ বিদেশ থেকে ভক্তদের ঢল নামবে বোঝাই যাচ্ছে। ভাবা যায় এই সব হিন্দু ভক্তরা মন্দির নির্মাণের জন্য কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছে। টাটা, আম্বানি এরা নিজের খরচে মন্দির করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ ট্রাস্ট রাজি হয়নি। তারা চেয়েছেন দেশের লোকের টাকায় এই নির্মাণ হোক। তাই আধা সরকারি সংস্থা Larsen and Toubro (L & T) -কে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা লাভ ব্যতিরেকে শুধু নির্মাণ খরচটুকুই নেবে। □

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের ক্রমিক ইতিহাস

রাকেশ দাশ

প্রথম পর্যায়

● অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের পরে তাঁর পুত্র কুশ রাজা হন। কুশের বংশে মহাভারতের যুদ্ধে কোশলরাজ বৃহদবল অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। পরে অযোধ্যানগরী তার গৌরব হারিয়ে ফেলে।

● কলিযুগে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক শ্রীরামজন্মভূমি অন্বেষণ এবং মন্দির নির্মাণ হয়। ১১ শতাব্দীতে জীর্ণোদ্ধার।

● বাবরের আক্রমণের সময়ে অযোধ্যাতে মহাত্মা শ্যামানন্দের আশ্রম ছিল। সেখান থেকেই সমস্ত কিছু চালিত হতো।

● শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খোয়াজা কজল আব্বাস মুসা।

● কিছুদিন পরে তার সঙ্গী হয় জালাল শাহ। জালাল শাহ এবং মুসার চক্রান্ত—খুর্দ মক্কা। মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির চক্রান্ত।

● রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বাবর আহত হলে জালাল শাহ তার শুশ্রূষা করে। পরের যুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হন। তার পরে জালাল শাহের কথামতো বাবর অযোধ্যাতে মন্দির ভাঙার কাজে মীরবাঁকি খাঁকে নিযুক্ত করে। অযোধ্যা দখলের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে অযোধ্যার বাইরে থেকে প্রচুর মুসলমানের মৃতদেহ অযোধ্যাতে এনে যত্র তত্র কবর দেওয়া শুরু হয়।

● মহাত্মা শ্যামানন্দকে অযোধ্যা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ভিটির রাজা মহতাব সিংহ ১.৭৪ লক্ষ সৈনিক-সহ আক্রমণ করেন। ৪.৫ লক্ষ মুঘল সৈনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে মহতাব সিংহ এবং তাঁর সমস্ত সৈনিক মৃত্যুবরণ করে।

● মন্দিরের পুরোহিতরা মন্দির ভাঙতে বাধা দেয়। এর পরে মীরবাঁকি তোপের সাহায্যে মন্দির ভেঙে ফেলে মসজিদ নির্মাণ শুরু করে।

● জলের বদলে মৃত সৈনিকদের রক্ত দিয়ে মসজিদের ভিত নির্মাণ হয়।

● দেবীদীন পাণ্ডে ৯০ হাজার সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কে একত্রিত করে ৫ দিন যুদ্ধ করেন। ষষ্ঠ দিনে মীরবাঁকির সঙ্গে যুদ্ধের সময় মীরবাঁকির দেহরক্ষী পিছন থেকে মাথায় গুলি করে।

● হংসবরের রাজা রণবিজয় সিংহ ২৫০০০ সৈনিক নিয়ে আক্রমণ করেন। ১০ দিনের যুদ্ধের পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

● রণবিজয়ের পত্নী জয়রাজ কুমারী মহিলাদের একত্রিত করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন।

● জয়রাজের গুরু মহেশ্বরানন্দজী সন্ন্যাসী রামভক্তদের একত্রিত করে যুদ্ধে শামিল হন।

● ইতিমধ্যে বাবরের মৃত্যু। ১০ বার আক্রমণের পরে জয়রাজ কর্তৃক অযোধ্যা দখল। হুমায়ুন কর্তৃক পুনরাক্রমণ।

● মহেশ্বরানন্দজীর মৃত্যুর পরে স্বামী বলরামচারী আবার সৈন্য সংগ্রহ করেন। বারবার আক্রমণ করেন, বারবার দখল করেন।

● বলরামচারীর বীরত্বে প্রভাবিত বাদশা আকবর টোডরমল ও বীরবলের পরামর্শে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

● ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পুনরাক্রমণ। জাঁবাজ খাঁর নেতৃত্বে আক্রমণ।

● প্রয়াগের অহল্যাঘাটের পরশুরাম মঠের মোহন্ত এবং সমর্থ স্বামী রামদাসের শিষ্য বৈষ্ণব দাসজী আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্কল্প নেন। ৩০ বার যুদ্ধ করেন।

● জাঁবাজ খাঁর পরাজয়ের পরে হাসান আলি ৫০ হাজার সৈনিক নিয়ে আক্রমণ করে।

● বৈষ্ণবদাসজীর থেকে খবর পেয়ে গুরু গোবিন্দ সিংহ নিহংগ সেনাকে অযোধ্যায় পাঠান।

● এই ঘটনার চার বছর পরে ঔরঙ্গজেবের পুনরাক্রমণ।

● কন্দর্পকূপে ১০ হাজার হিন্দুর শব। মন্দির ভেঙে ফেলা হয়।

● ১৮৫৩ থেকে পুনরায় হিন্দুদের সংগ্রাম। ১৮৫৫ সালে মুসলমানদের দ্বারা হনুমানগঢ়ী আক্রমণ। আক্রমণ প্রতিহত হয়। ১৮৫৭ মহাসংগ্রামের সময়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে আপোশ করে। একটি ছোটো চালাঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়। মন্দির- মসজিদ পাশাপাশি থাকে।

● ১৮৫৮তে এক মৌলবির নালিশের ভিত্তিতে ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীন প্রশাসন একটি প্রাচীর নির্মাণ করে মন্দির ও মসজিদ আলাদা করে দেয়।

তৃতীয় পর্যায়

● ১৮৮৩ সালে নির্মোহী আখাড়া একটি মন্দির নির্মাণের অনুমতি চায়। ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনার আর্জি খারিজ করে।

● ২৯ জানুয়ারি ১৮৮৫ নির্মোহী আখাড়ার মহন্ত রঘুবর দাস ব্রিটিশ- ভারত সরকার এবং মহম্মদ আসগরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। রামলালা ও পুরোহিতদের কষ্টের কথা নিবেদন করে পাকা মন্দির বানানোর অনুমতি চাওয়া হয়। বিচারপতি হরিকিষণ সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখেন যে, রামলালার মূর্তি ও চরণচিহ্ন এই পরিসরে পূজিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঝামেলা হবে এই যুক্তিতে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না।

● উচ্চতর আদালতে দু' বার আপিল করা হয়। ওই স্থানটি রামলালার জন্মস্থান বলে স্বীকার করার পরেও আদালত মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় না।

চতুর্থ পর্যায়

● ১৯৪৮-এ রাঘব দাস বিধায়ক নির্বাচিত হন। মন্দিরের প্রসঙ্গ আবার উপস্থাপিত হয়। ১৯৪৯-এ রাঘব দাসের উদ্যোগে প্রশাসনের নিকট মন্দির নির্মাণের অনুমতি চাওয়া হয়।

● ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনারকে কে নায়ার সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং নিজের সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রিপোর্ট দিলেন যে ওই স্থানে জানকী, লক্ষ্মণ-সহ রামলালার বিগ্রহ বিদ্যমান। সুতরাং মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া উচিত।

● এরই মধ্যে অযোধ্যা থানা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি নালিশ রুজু করে যে মসজিদের ভিতরে চুপিসাড়ে রামলালার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে।

● জওহরলাল নেহরু মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নির্দেশ দেন ব্যক্তিগতভাবে অযোধ্যার মামলা দেখতে।

● চিফ সেক্রেটারি ভবান সহায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কে কে নায়ারকে চিঠি দিয়ে জানতে চান যে, মসজিদের মধ্যে থেকে মূর্তি সরানো হয়নি কেন? কে কে নায়ার লম্বা উত্তরে জানান যে, মন্দিরের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষে এই সমর্থন উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

● অতিরিক্ত সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মার্কণ্ডেয় সিংহ ১৪৫ ধারা জারি করেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে রিসিভার নিযুক্ত করা হয়। রামলালার ভোগ, পূজা ইত্যাদি সরকারিভাবে চলতে থাকে।

● ১৯৪৯ সালে অযোধ্যা হিন্দু সভার সভাপতি পণ্ডিত গোপাল সিংহ বিশারদ অযোধ্যা (তদানীন্তন ফৈজাবাদ) দেওয়ানি আদালতে শ্রীরামজন্মভূমির কমিটি হিন্দুদের বলে দাবী করে, জমিটি হস্তান্তরের দাবিতে মামলা দায়ের করেন। এর পরে বিভিন্ন আদালতে একের পর এক মামলা দায়ের হতে থাকে। কোনো মামলার কোনো নিষ্পত্তি হয়নি।

পঞ্চম পর্যায়

● রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের কথামতো মোরপন্ত পিংলে-র নীরব, নিভৃত পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব গ্রহণ।

● ১৯৮৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে রামরথের যাত্রা শুরু। সীতামঢ়ী থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর রওনা হয়, ৮ অক্টোবর অযোধ্যা পৌঁছায়। ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার দিনে দিল্লি পৌঁছায়। পরিস্থিতির বিকটতার কারণে আন্দোলন তাৎক্ষণিক ভাবে স্থগিত হয়।

● ১৯৮৬-তে শিবরাত্রিতে তালা ভেঙে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তালা খোলা হয়। মুসলমানদের বাবরি মসজিদ সংঘর্ষ সমিতি গঠন।

● ১৯৮৯-তে প্রয়াগ উচ্চ আদালত হিন্দুদের এই ভূমি দিয়ে দেওয়ার এবং সকলের প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

● ৩০ অক্টোবর, ১৯৯০ অযোধ্যায় করসেবকদের প্রবেশ এবং সৌধের চূড়ায় গৈরিক ধ্বজ প্রতিষ্ঠা। মুলায়ম সিংহের নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে মুলায়ম সিংহের পরাজয়।

● ১৯৯২-তে পুনরায় সমগ্র দেশের হিন্দুরা অযোধ্যায় উপস্থিত হন এবং বিতর্কিত ধাঁচা ধূলিসাৎ হয়।

ষষ্ঠ পর্যায়

● আইনি লড়াই।

● আদর্শ স্থাপনের লড়াই। ন্যারেটিভ নির্মাণ।

● ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর আইনি সফলতা।

● কেবল মন্দির নির্মাণ নয়, সকলের সহমতে মন্দির স্থাপনা। রামরাজ্য, রামনীতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে উচ্চারিত। কারও মধ্যে বিরোধিতা নেই। বরং সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন।

● ৫ আগস্ট মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি। ২০২০ সালের ওই দিন ভূমিপূজনের মাধ্যমে রাম মন্দির পুনর্নির্মাণ আরম্ভ।

● ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার ভব্য কার্যক্রম। □

মানব হৃদপিণ্ডের অজানা রহস্যের সমাধান করলেন তরুণ বাঙ্গালি বিজ্ঞানী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল....!' যার প্রতিটি স্পন্দনে আমাদের বেঁচে থাকা, জাগতিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ অনুভব; তার 'অপার-রহস্য' ক'জনই-বা উপলব্ধি করতে পেরেছেন! কবির বাণীতে মানব-হৃদয়ের মর্মকথা বারে বারে ফুটে উঠেছে ঠিকই, তবে হৃদপিন্ডের আণবিক গঠনের কিছু 'রহস্য' বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানীদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। সেই রহস্যের সমাধান করলেন একজন বাঙ্গালি। তিনি তরুণ বাঙ্গালি বিজ্ঞানী তথা জঙ্গলমহলের 'ভূমিপুত্র' এবং খড়্গপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী ড. দেবব্রত দত্ত। যে হৃদস্পন্দন আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রতি মুহূর্তে সারা শরীরে অনবরত রক্ত পাম্প করার জন্যই আমরা সেই হৃদস্পন্দনের 'লাব ডাব' ধ্বনি অনুভব করি। স্বাভাবিক কারণেই হৃদবিজ্ঞানীরা 'লাব ডাব' ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হৃদযন্ত্রের এই সংকোচন-প্রসারণের আণবিক পদ্ধতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে চলেছেন বহু বছর ধরে। বিগত ৬০ বছরের এই রহস্যের সমাধান করলেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস্ মেডিক্যাল স্কুলে গবেষণারত বাঙ্গালি বিজ্ঞানী ড. দেবব্রত দত্ত ও তাঁর সহকারী গবেষকরা।

প্রসঙ্গত, হৃদ-বিজ্ঞানীদের মতে, অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট ও মায়োসিন ফিলামেন্ট নামক প্রোটিন ফিলামেন্টদ্বয়ের একে অপরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াই হলো এই 'লাব ডাব' ধ্বনি উৎপন্ন হওয়ার অন্যতম কারণ। অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের আণবিক গঠন বিজ্ঞানীদের জানা থাকলেও, মায়োসিন ফিলামেন্টের 'আণবিক গঠন' ছিল অজানা। বিভিন্ন হৃদরোগের কারণ খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে, ওষুধ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটে এর আণবিক গঠন জানা বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল খুবই জরুরি একটি বিষয়। বিজ্ঞানীদের মতে, মানব হৃদপিন্ডের মায়োসিন ফিলামেন্ট কীভাবে আণবিক স্তরে কাজ করে এবং হৃদরোগে তার গঠনগত কী পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে হৃদবিজ্ঞানী ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ধন্দের মধ্যে ছিলেন। সেই রহস্যের সমাধান করলেন আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনী দেবব্রত-সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত তাঁদের এই গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞানী মহলে সাড়া ফেলেছে।

'নেচার'-এর আন্তর্জাতিক নিউজ ডিপার্টমেন্ট 'নেচার নিউজ অ্যান্ড ভিউজ'-এও প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের এই আবিষ্কারের তথ্য। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্রায়ো-ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সহায়তায় মানুষের হৃদপিন্ড থেকে বের করা এই মায়োসিন ফিলামেন্টের গঠন আবিষ্কার করেছেন ড. দেবব্রত দত্ত ও তাঁর সহ গবেষকরা। এটি মায়োসিন, টাইটিন ও মায়োসিন বাইন্ডিং প্রোটিন সি-এর একটি অভূতপূর্ব কমপ্লেক্স আর্কিটেকচার (জটিল গঠন) বলে জানিয়েছেন জঙ্গলমহল বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র দেবব্রত। উল্লেখ্য যে, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর দেবব্রত কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রসায়নে সাম্মানিক সহ স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। প্রথম থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন দেবব্রত। দেশের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়্গপুরে বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত গবেষণা করার মধ্য দিয়ে দেবব্রত সেই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যান। ২০১৯ সালে আইআইটি খড়্গপুর থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে দেবব্রত আমেরিকায় রওনা দেন অত্যাধুনিক গবেষণার উদ্দেশ্যে। প্রথমে আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ্'-এ গবেষণা করার পর 'ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস্ মেডিক্যাল স্কুলে' রেডিওলজি বিভাগে ড. রজার ক্রেগের ল্যাবরেটরিতে যোগদান করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় এই অভিযান। 'বাঙ্গালি বিজ্ঞানী' দেবব্রত দত্তের এই গবেষণা হৃদরোগের আণবিক কারণ নির্ধারণে এবং ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মহল। ◻

সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মা

পিতৃহারা সাত-আট বছরের ছেলেটি স্কুল থেকে বাড়িতে এসে মাকে বলল— মা, আজ প্রিন্সিপাল আজ আমাকে আদর করে কিছু ক্যান্ডি দিয়েছেন আর, তোমার জন্য এই চিঠিটা।

মা চিঠিখানা খুলে পড়ে কেঁদে ফেললেন। মায়ের চোখে জল দেখে ছেলেটি বলল— মা, তুমি কাঁদছ কেন?

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন— বাবা, এটা আনন্দের কান্না। বলেই ছেলেকে জনিয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললেন, আমার জিনিয়াস পুত্র, তোমাকে চিঠিটা পড়ে শোনাই।

মা চিৎকার করে প্রিন্সিপালের লেখা ভাষা বদল করে নিজের মতো করে পড়তে লাগলেন —

" ম্যাম, আপনার ছেলেটি খুবই জিনিয়াস। ছোটো শহরের এই স্কুলে আপানার ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার মতো শিক্ষক আমাদের নেই। তাই, যদি পারেন আপনার ছেলেকে বড়ো শহরের বড়ো কোনো স্কুলে ভর্তি করে দিলে ভালো হয়। আপনার ছেলে একদিন সমগ্র বিশ্বের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

চিঠিখানা পড়েই মা আবার ছেলেকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার জিনিয়াস ছেলেকে আমি
নিজেই পড়াবো। তারপর মা নিজেই ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বানালেন। তিনি টমাস আলভা এডিসন। বাবা স্যামুয়েল এডিসন। মা ন্যান্সি এডিসন। যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর মিলানে ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কানাডা থেকে বিতাড়িত রাজনীতিবিদ। আমেরিকায় তিনি কাঠের ব্যবসা করতেন আর মা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। সাত ভাই-বোনের মধ্যে টমাস ছিলেন কনিষ্ঠ। ছোটোবেলায় অসুস্থ হওয়ার কারণে পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ ছিল না। ফলে স্কুলে শিক্ষকদের কাছে বকাঝকা খেতেন। এসবের খারাপ প্রভাব যাতে টমাসের ওপর না পড়ে তাই মা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং বাড়িতেই পড়াশোনা করান।

মায়ের কাছে পড়াশোনা করেই টমাস বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হন। বৈদ্যুতিক বাল্ব, শব্দ রেকর্ডিং, মুভি ক্যামেরা বা চলমান ছবি ইত্যাদি-সহ হাজারো আবিষ্কার রয়েছে তাঁর। মায়ের মৃত্যুর পর টমাস আলভা এডিসন একদিন তাঁদের সেই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঘর পরিষ্কারের সময় বহু বছর আগে স্কুলের প্রিন্সিপালের দেওয়া চিঠিটি মায়ের বাক্সের মধ্যে পেলেন। চিঠিখানা পড়ে টমাস কেঁদে ফেললেন। তাতে লেখা ছিল—

" ম্যাডাম,

আপনার ছেলে টমাস একজন মেন্টালি রিটার্ডেড। সে এতটাই নির্বোধ যে তাকে শিক্ষা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। কারও আছে বলে আমাদের জানা নেই। আপনার ছেলের কারণে আমাদের স্কুলের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে, তাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনার ছেলেকে স্কুল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।"

শিক্ষণীয় বিষয় হলো, সন্তানের সঙ্গে ইতিবাচক আচরণ করতে হবে। কখনোই নেতিবাচক নয়। গৃহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর মা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। *(সংগৃহীত)*

বীর বনবাসী

অল্লুরী সীতারাম রাজু

১৮৯৭ সালের ৩ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের মোগল্লু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ২৪ বছর বয়সে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। গেরিলা পদ্ধতিতে জনজাতি যুবকদের প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনি রম্পা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে নিজস্ব পঞ্চায়েত শাসন চালু করেন। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি মান্যম বীরুদ অর্থাৎ অরণ্যের বীর নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে চিন্তাপল্লে গ্রামে ইংরেজ পুলিশ তাঁকে বন্দি করে এবং গাছে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে।

এসো সংস্কৃত শিখি

পুরুষরা পরস্পর পরিচয় করার সময়

মম নাম জয়ঃ

আমার নাম জয়।

ভবত নাম কিম্?

আপনার নাম কী?

মম নাম শ্যামঃ।

মম নাম গোপালঃ। মম নাম অভিজিতঃ। মম নাম পিন্টুঃ। মম নাম বিপ্লবঃ। মম নাম কৃষ্ণেন্দুঃ। মম নাম তাপসঃ। মম নাম প্রণবঃ।

এভাবে সবাই নিজের নিজের নাম বলতে হবে।

ভালো কথা

মাছ বন্ধু

গত রবিবার আড়যায় বাবার সঙ্গে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম মানুষে-মাছে বন্ধুত্ব। দুপুরে মামাতো দাদা পাড়ার এক দাদুর বাড়ি নিয়ে গেল। দাদু একটা বড়ো বাটিতে ভাত নিয়ে বাড়ির পেছনে একটা পুকুরঘাটে বসলেন। পুকুরটা খুব বড়ো। আমাদের একটু দূরে দাঁড়াতে বললেন। দাদু হাত দিয়ে জলে দুবার শব্দ করতেই মাঝ পুকুর থেকে দুটো বড়ো ঢেউয়ের মতো কী যেন আসতে লাগল। একেবারে দাদুর কাছে এসে ভেসে উঠলে দেখলাম, দুটো বড়ো রুইমাছ। দাদু ওদের সামনে বাটিটা ধরতেই ওরা খেতে শুরু করল। দাদুও ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমাদের ইশারা করতেই আমরা একেবারে কাছে এলাম। আমাদের দেখে ওরা ভয় পেল না। দাদু বললেন, এরা আমার পোষা। রোজ দুপুরে এদের ভাত খাওয়াই।

শ্রেয়া মহান্তি, নবম শ্রেণী, , হুটমুড়া, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) য় অ ণো রু

(২) গ হ স অ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) লা ও কা লি বু য়া

(২) কা নু কা ন দা য়

২৭ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বাতানুকূল (২) আকাশবাণী

২৭ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বহিরাগমন (২) বাদপ্রতিবাদ

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌভিক শর্মা পুরকায়স্থ, রবীন্দ্রনগর, কোচবিহার। (২) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দ: ২৪ পরগনা। (৩) সুজিত মাহাত, চিঙ্গিশপুর, দঃ দিনাজপুর। (৪) অনন্যা সাহা, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

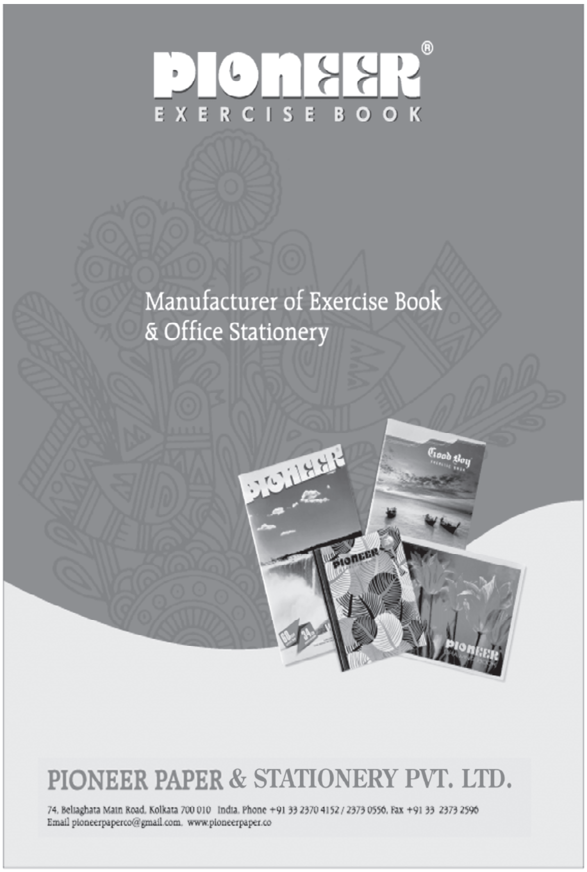

With Best Compliments from -

A

Well wisher

হিমালয়ের মতো উন্নত ব্যক্তিত্ব
রঙ্গা হরিজী

ড. মনমোহন বৈদ্য

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ রঙ্গা হরিজীর পুণ্যস্মরণে তাঁর জীবনের কিছু অস্পষ্ট প্রসঙ্গকে একত্রিত করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-কার্যবাহ ড. মনমোহন বৈদ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি— স্ব: স

২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর সকাল ৭টায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক, প্রাক্তন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ রঙ্গা হরিজী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং নিজধামে যাত্রা করেন। হিন্দুত্বের চিন্তাধারার উচ্চ বৌদ্ধিক যোদ্ধা, আন্তরিকতায় উষ্ণতা ও শীতলতার একত্রিত অনুভূতিপূর্ণ, বাকপটু, লক্ষ্য অনুসারে নতুন চিন্তাভাবনাকারী এবং এক রাষ্ট্রভক্ত সঙ্ঘ ঋষির জীবনযাত্রা সমাপ্ত হলো। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তেরো বছর বয়সে স্বয়ংসেবক হয়ে তিনি ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সঙ্ঘকাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি কেরালার প্রান্ত প্রচারক এবং ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন। সঙ্ঘের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও রবিন শর্মা রচিত 'এ লিডার হু হ্যাড নো টাইটেল' বইয়ের বর্ণনা অনুসারে রঙ্গা হরিজী একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ছিলেন।

কমিউনিস্টদের শক্তিশালী ঘাঁটি কেরালায় সঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় ভাবনার বীজরোপণ করা, 'এক্সক্লুসিভিস্ট' এবং সমাজতান্ত্রিক হিংস্র বামপন্থার আদর্শগত এবং সবরকম চ্যালেঞ্জের সক্ষম উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে হিন্দুত্বের সর্ব-সমাবেশক এবং জাতীয় ভাবনাকে কেরালায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে জ্ঞানী ও কর্মঠ কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তাদের মধ্যে রঙ্গা হরিজী একজন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হিংস্র কমিউনিস্টদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২৯৮ জন স্বয়ংসেবক প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগ করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়েছিলেন। এই সমস্ত স্বয়ংসেবকের পরিবারকে সহযোগিতা করা, তাদের সান্ত্বনা দেওয়া, তাদের সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত রাখা— এসব সহজ কাজ ছিল না। এজন্য প্রয়োজনীয় হৃদয়ের দৃঢ়তা কোথা থেকে এসেছে? একদিন যখন আমি তাঁদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তারা হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এরকম সংঘর্ষের জীবনে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু রঙ্গা হরিজীর হৃদয় কতটা সংবেদনশীল ও কোমল ছিল, তা সেদিন আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

গুরুতর ও গভীর বিষয়গুলিকে উদাহরণের সাহায্যে বিনোদনমূলক শৈলীতে অভিনয়-সহ বোঝানো তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সংস্কৃতের শ্লোক ও সুভাষিতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁর জানা বা পড়াশোনায় যে সুভাষিতগুলি ছিল, সেগুলি তিনি তাঁর লেখায় ও বৌদ্ধিকের মধ্যে ব্যবহার করতেন। তা পরে এগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম— সুধী বাণী, সুধা বাণী। তাঁর নতুন নতুন ভাষা শেখার পদ্ধতি ও উৎসাহ অদ্ভুত ছিল। গুজরাটে প্রথমবার এসেই অল্পদিনের মধ্যে গুজরাটি ভাষা বলতে ও পড়তে শিখে গেলেন, এটা দেখে আমার আশ্চর্য লেগেছিল। গভীরভাবে পড়া, মৌলিক চিন্তা করার চেষ্টা নিরন্তর করতে থাকতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা ৬২টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

কেরালায় অসামাজিক কমিউনিস্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় রঙ্গা হরিজীই প্রথম যিনি কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহান চিন্তাবিদ দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী এমনই

ফঃ ৬

একটি কথপোকথনে উপস্থিত ছিলেন। যখন মালায়ালম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরী' কীভাবে সংঘাতগ্রস্ত কেরালায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তার উপর একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ শুরু করেছিল, তখন রঙ্গাহরিজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সম্পাদককে এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

নতুন ধারণার যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়ে মানুষকে আলাদাভাবে পড়তে ও চিন্তা করতে তিনি উৎসাহিত করতেন। দীপ্তি ভার্মা একজন উদীয়মান লেখিকা। তিনি একটি খুব ভালো বই লিখেছেন— 'পঞ্চকন্যা'। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই পাঁচ কন্যা চিরস্মরণীয়। আজকের যুগের মেয়েদের পঞ্চকন্যার জীবন থেকে কী শিক্ষা নেওয়া উচিত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি সত্যিই খুব ভালো। এই সিরিজের প্রথম প্রবন্ধ 'অহিল্যা' সম্বন্ধে দীপ্তিজী রঙ্গাহরিজীকে তাঁর মতামত জানার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দীপ্তিজী রঙ্গা হিরিজীর নাতনির বয়সী। কিন্তু নতুন ধারণা এবং নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়ে চিঠির শেষে, তাকে আশীর্বাদ না করে তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুন'। এতে তাঁর বিনম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অহল্যা' পড়ার পর, রঙ্গাহরিজী উত্তরে লেখেন—

Sushri Deeptiji,

Namaskars. Yesterday I read your write-up on Ahalya. In short, it is very fine. I very much enjoyed the original approach and elucidation. I think I can rightly expect, the write-ups on the other four also will be in the same refrain.

I would like to bring to your notice one happy fact. In Kerala, there was a famous lady writer Lalithambika Antharjanam born about 120 years ago. Though she belonged to the orthodox Namboodiri (Kerala Brahmin) community. She has authored a book in Malayalam named Sita Muthal Satyavati Vare, meaning 'From Sita to Satyavati.'

In that, one piece is on Ahalya. She says in it the whole tragedy was due to a mis-match, the very point you have emphasised. This book is in Malayalam. It was the first book I read wherein a woman evaluates a woman, which by itself is extremely important.

I appreciate you have done verily that, I very much liked the interpretation of your satisfying the thirst and temperament of sisters and mothers of these times tempered by science.

Further, I am awaiting the other four as and when completed.

Through your good self.

May God bless us all,

Yours sincerely,
Ranga Hari

রসবোধ ছিল রঙ্গা হরিজীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সঙ্ঘের সর্বভারতীয় বৈঠকে অবসর সময়ে যদি কোথাও কার্যকর্তাদের ভিড় দেখা যায়, হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ওঠে, তবে নিশ্চিতভাবে মনে করা যায় যে রঙ্গাহরিজী অবশ্যই সেখানে আছেন। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ছিল খুবই কম (৫ ফুটের কম), তাই এমন ভিড়ে তাকে বাইরে থেকে দেখা যেত না। কিন্তু ওখান থেকে হঠাৎ হাসির ফোয়ারা উঠলে তা তাঁর উপস্থিতির ইঙ্গিত দিত। একবার বিখ্যাত লেখক খলিল জিব্রানের 'তোমার শিশু' কবিতাটি হাতে পেলাম। আমিও তাঁকে অনেকবার উদ্ধৃত করতাম। কিন্তু আমি যে অসম্পূর্ণ পড়েছি তা জানতাম না। একবার এক জায়গায় আমি তাঁর কবিতার উল্লেখ করছিলাম, তখন রঙ্গা হরিজীও সেখানে ছিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে জিব্রানের এখনও কিছু কবিতা তোমার পড়তে বাকি আছে। তখন e-mail ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় রঙ্গা হরিজীর কেন্দ্র ছিল মুম্বাই। ভ্রমণ শেষ করার দুই মাস পর তিনি যখন মুম্বই পৌঁছান, তখন তিনি খলিল জিব্রানের সম্পূর্ণ কবিতা 'ইয়োর চিলড্রেন' কাগজে লিখে পাঠান এবং চিঠিতে হাস্যরসাত্মক শৈলীতে লিখেছিলেন, 'Dear Manmohan, sending 'Your Children' to one who has none by one who also has none.---R. Hari.' (সঙ্ঘের সান্নিধ্যে যারা নতুন এসেছেন, এরকম পাঠকদের জন্য— আমরা দুজনেই সঙ্ঘের প্রচারক এবং প্রচারকরা অবিহাহিত হয়ে থাকে)। প্রচারক হলেন 'অনিকেত', তাঁর অবশ্যই একটি কেন্দ্র রয়েছে যা সংগঠনের প্রয়োজন অনুসারে সঙ্ঘ ঠিক করে থাকে।

রঙ্গাহরিজীর কেন্দ্র ছিল মুম্বই, এটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এক সময় তিনি যখন গুজরাটে আসেন, আমরা একসঙ্গে একজন প্রখ্যাত শিল্পপতির বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই শিল্পপতি স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক কথোপকথনে রঙ্গা হরিজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'হরিজী, কখন এসেছেন?' এবং তিনি জানতে চেয়েছিলেন হরিজী কতদিন গুজরাটে থাকবেন। সেজন্য তিনি হরিজীকে অকপটে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে ফিরবেন?' হরিজীর তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল, 'আমি তিনদিন পর এখান থেকে দিল্লি যাব। ফিরব না। আমার কেন্দ্র মুম্বাই। আমি যখন মুম্বই যাই— তখন ফিরে যাই, এই কথা বলি।' নৈমিত্তিক কথোপকথনেও আমি তাঁর অনিকেতের

ব্যবহার দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। রঙ্গা হরিজী তাঁর জীবন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে অনেক কার্যকর্তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। কিন্তু কয়েক বছর আগে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার পর তিনি যা লিখেছিলেন, তা-ও অনুপ্রেরণাদায়ক ও পথপ্রদর্শক। কেরালার কার্যকর্তাদের সম্বোধন করে তাঁর লেখা খামবন্ধ চিঠি যা তিনি কেরালার প্রান্ত প্রচারকের কাছে রেখেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পরেই খুলতে হবে এমন নির্দেশ ছিল। রঙ্গা হরিজী তাতে লিখেছেন যে, জীবিতাবস্থায় একজন মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু করতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পর নয়। তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল, 'আমার মৃত্যুর পরে, আমার দেহকে কোনও নির্দিষ্ট বর্ণের শ্মশানে নয়, যেখানে সাধারণ লোকেদের দাহ করা হয়, সেখানেই যেন দাহ করা হয়। আমি সারা জীবন জাতিভেদ প্রথা বিশ্বাস করিনি, মৃত্যুর পরেও তাই করতে চাই। এমন একটি ঐতিহাসিক স্থান যেখানে পাণ্ডবরা তাদের পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দান করেছিলেন তা হলো কেরালার ভারতী নদীর তীরে আইভরম মঠ, সেখানে আমার শেষকৃত্য করা উচিত। পরে সেলিব্রিটির মতো দু-তিনটি জায়গায় আমার চিতাভস্ম বিসর্জন না করে কাছের জলাশয়ে বিসর্জন দিতে হবে।

আমি ব্রহ্মকপালে আমার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে নিয়েছি, তাই আমার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা পিণ্ডদান করার প্রয়োজন নেই। আমি আমার ৫০টি প্রকাশিত বইয়ের সমস্ত স্বত্ব সঙ্ঘকে দিয়ে দিচ্ছি। কেরালায় কমিউনিস্ট কর্মীদের মৃতদেহ লাল কাপড়ে মুড়িয়ে শেষকৃত্য করার রীতি হয়েছে। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মৃতদেহ গৈরিক রঙের কাপড়ে মুড়িয়ে তাদের পোড়ানোর প্রথা কেরালায় কোনও কারণে শুরু হতে পারে, তবে তা অনুচিত। গৈরিক ধ্বজ আমাদের গুরু। তাই শ্মশানে দাহকাজের সময় আমার মৃতদেহ গৈরিক কাপড়ে যেন মুড়ে দেওয়া না হয়!'

রঙ্গা হরিজী তাঁর এই শেষ ইচ্ছা আগেই লিখে রেখেছিলেন। তিনি আমাদের সারা জীবন তার আচরণের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছেন। এমনকী মৃত্যুর সময়ও তিনি একটি উপলব্ধি এবং চিন্তার একটি দিক দিয়ে চলে গেলেন। রঙ্গা হরিজী তাঁর জীবনের শেষ প্রার্থনা তিনটি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

মামিকান্তিম্ প্রার্থনা
করণীয়ম্ কৃতং সর্বম্
তজ্জন্ম সুকৃতং মম
ধন্যোস্মি কৃতকৃত্যোস্মি
গচ্ছাম্যদ্য চিরং গৃহম্॥ ১ ॥
কার্যার্থং পুনরায়াতুম্
তথাপ্যাশাস্তি মে হৃদি
মিত্রৈ সহ কর্ম কুর্বন্
স্বান্তঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥
এষা চেৎ প্রার্থনা ধৃষ্টা
ক্ষমস্ব করুণানিধে
কার্যমিদং তবৈবাস্তি
তাবকেচ্ছা বলীয়সী ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ, সমস্ত কাজ শেষ করে, আমি ধন্য ও কৃতজ্ঞ এবং আজ আমি আমার চিরন্তন ধামে চলে যাচ্ছি। তবু একই কাজের জন্য আমার ফিরে আসার ইচ্ছা আছে, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এই কাজটি করতে আরও বেশি করে অনাবিল সুখ আনবে। আমার এই প্রার্থনা যদিও ধৃষ্টতা, হে করুণানিধান! ক্ষমা করো, এই কাজটিও আপনার এবং আপনার ইচ্ছায় তা পূর্ণ হবে।

মৃত্যুকালেও এমন ভারসাম্যপূর্ণ, আশাবাদী চিন্তা এবং সম্পূর্ণ নিবেদন দেখে মারাঠি কবি শ্রী বা. ভ. বোরকারের একটি কবিতা মনে আসে। এর হিন্দি অনুবাদ হলো--- 'অস্তমিত সুন্দর, উদধিতে সূর্যের মতো। 'যামিনীকে আগুনের মতো উদ্ভাসিত করে যে ব্যক্তি হিমালয়ের মতো এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে, তাকে আমরা সবাই দেখেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁর সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছি। আমাদের মতো সাধারণ কর্মীদের তিনি বন্ধু করে নিয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কেরালার কমিউনিস্ট দুর্গে সতত সংঘর্ষকারী, ধ্যেয়নিষ্ঠ সঙ্ঘযাত্রীর শৃঙ্গল নির্মাণকারী এই মহান পুরুষকে, প্রবীণ পথনির্দেশককে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম। মারাঠি কবি শ্রী বা.ভ. বোরকারের কবিতার আরও দুটি লাইন মনে আসে— 'সত্য সুন্দর চরণ যে ধ্যেয় পথে চলেছে। মরুভূমিতে, বনভূমিতে স্বস্তিপদ্ম প্রস্ফুটিত করেছে।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর জন্মশতবার্ষিকী (২০০৫-২০০৬) উপলক্ষ্যে, তাঁর দীর্ঘ ৩৩ বছরের (১৯৪০-১৯৭৩) প্রদত্ত অসংখ্য বক্তৃতা ও বৌদ্ধিকের সংগ্রহ এবং তা সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার মহান কাজ দ্বাদশ খণ্ডে 'শ্রীগুরুজী সমগ্র' প্রকাশ--- এটি রঙ্গা হরিজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। একইভাবে, শ্রীগুরুজীর চিরন্তন চিন্তার অমৃতের মতো 'শ্রীগুরুজী ভিশন অ্যান্ড মিশন' এবং শ্রীগুরুজীর জীবন চরিত্রের সংকলন রঙ্গা হরিজীর শ্রীগুরুজীর প্রতি পবিত্র নৈবেদ্য নিবেদন। □

With Best Compliments
from -
A
Well Wisher

এক কর্মযোগীর স্মৃতিচারণ

দিবাকর ঘোষ

বহু কর্মোদ্যোগের মূর্ত প্রতীক এক কর্মবীর তরুণ কুমার পণ্ডিত। সমাজসেবায় নিয়োজিত একজন সমাজসেবী, মানবদরদি মানুষ এলাকার প্রত্যেকের কাছে 'বড়দা' নামে পরিচিত। বাবা শ্রীযুক্ত রামানন্দ পণ্ডিত এবং মা শ্রীমতী মালতী পণ্ডিত। তিন ভাইয়ের মধ্যে বড়ো তরুণ পণ্ডিত। দুই ভাই যথাক্রমে তপন পণ্ডিত ও স্বপন পণ্ডিত। তাকে বাড়ির সবাই 'বড়দা' বলে ডাকত, সেই দেখে গ্রামের অন্যরাও 'বড়দা' বলেই ডাকতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি এলাকার ছোটো-বড়ো সবার কাছে প্রিয় 'বড়দা' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন তাঁর কাজের মাধ্যমে।

মালদা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে কাঞ্চনতার গ্রাম। সেই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। মেধাবী ছাত্র হিসাবেই ছোটো থেকে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকেরই স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ছোটবেলায় দুরন্ত ও জেদি স্বভাবের ছিলেন। এরপর বাড়ি থেকে ৫ কিমি. দূরে যদুপুর হাইস্কুলে পড়াশোনা। এই বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী থেকে আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পড়াশোনা, ভাবের আদান প্রদান হতে থাকল। ক্লাসে কখনও প্রথম আবার কখনও দ্বিতীয় স্থান লাভ করতেন। একটি সাইকেলে করে সাঁই সাঁই করে সবাইকে পিছনে ফেলে স্কুলে পৌঁছে যেতেন। নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানেই থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা ঠাকুমা। একটি চৌকিতে বৃদ্ধা ঠাকুমা এবং সেই ঘরেই অন্য একটি চৌকিতে তরুণ ও আমি থাকতাম। পাশের দুটি ঘরের একটিতে তার দুই ভাই তপন ও স্বপন এবং অন্য একটি ঘরে বাবা-মা থাকতেন। ঠাকুমাও তাঁকে 'বড়দা' বলে ডাকতেন। ঠাকুমার কাছে রাত্রিবেলাতে গল্প শুনতাম, সংস্কারটা সেখান থেকেই। ধীরে ধীরে দুরন্ত তরুণ শান্ত হতে থাকল। পড়াশোনায় আরও মনযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকল।

বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকের ক্লাস বুঝতে অসুবিধা হলে তাঁর বাড়িতে চলে যেতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। একবার রাত্রি ৭টায় বাড়িতে এসে দেখি তরুণ নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। অপেক্ষা করতে থাকলাম, কিছুক্ষণ পর এল। জানতে পারলাম জীবন বিজ্ঞান স্যারের বাড়ি গিয়েছিল। স্যারের বাড়ি ছিল কালিয়াচক থানার সুজাপুরে। বাড়ি থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে। এইভাবে আপন চেষ্টায় পড়াশোনা চলতে থাকে।

১৯৭৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা। গ্রামের চারজন মাধ্যমিক দিল। পরীক্ষার পর গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খেলাধুলা চলতে থাকল। এই সময় একদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক কালীশঙ্কর চক্রবর্তী এবং জেলা প্রচারক সুধাময় দত্ত আমাদের গ্রামে এলেন। তাঁদের পরামর্শে গ্রামে সঙ্ঘের শাখা শুরু করার কথা হলো। বিস্তারক হিসেবে অমৃতির লক্ষ্মণ চন্দ্র কর্মকারকে নিয়ে এলেন সুধাময়দা। শুরু হলো সঙ্ঘের শাখা। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, গান, প্রার্থনা হতে থাকল। গ্রামে যেন উৎসাহের জোয়ার এল। হঠাৎ জানতে পারলাম সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ হবে কলকাতাতে। শাখা থেকে দু'জনকে কমপক্ষে যেতেই হবে। তরুণ পণ্ডিত নিশ্চিত হলো। আর একজন আমি এই হতভাগ্য বন্ধু দিবাকর ঘোষ। অর্থনৈতিক কারণে এবং আত্মীয় স্বজনদের বাধাদানে আমার যাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এদিকে তরুণের বাড়ি থেকে বলা হলো ও একা যাবে না। শেষে সঙ্ঘের আধিকারিকদের চেষ্টায়, যাতায়াতে সমস্ত বাধা কাটিয়ে ২৫ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। মালদা জেলা থেকে চল্লিশ জন শিক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে অমিত চৌধুরী, প্রণব মিত্র, ষষ্ঠী সাহা, সনৎ সাহা প্রমুখ। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হয়েছিল ২৪ পরগনা জেলার হাবরার অশোকনগরে।

প্রশিক্ষণের পরে বাড়িতে এসে নিয়মিত খাকি হাফপ্যান্ট পরে শুরু হলো নিত্য শাখায় যাওয়া-আসা। মুখ্যশিক্ষক হিসেবে তরুণ পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসেবে আমি। ইতিমধ্যে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে। সেখানেও তরুণ সবার থেকে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করে এলাকায় একটি সারা ফেলেছিল। গ্রামের চারজনই মাধ্যমিকে সফল হওয়ায় স্বভাবতই আশেপাশের গ্রামগুলির মধ্যে তার প্রভাব পড়ে। শাখার আগে প্রত্যেক বাড়ি থেকে ছেলেদের ডাকা হতো। পাড়ায় ভালো পরিবার এবং ভালো ছেলে হিসেবে প্রত্যেকের কাছেই তরুণের গ্রহণযোগ্যতা এমন ছিল যে অভিভাবকরা ছেলেদের মাঠে যেতে দিতে আপত্তি করত না। শাখা জোরদার চলতে থাকল। একজন সফল মুখ্যশিক্ষক, কার্যবাহ, মণ্ডল কার্যবাহ, খণ্ড কার্যবাহ, মহকুমা কার্যবাহ এবং জেলা কার্যবাহ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিকল্পনায় সঙ্ঘের কাজ বাড়তে থাকল।

ইতিমধ্যে মহকুমা প্রচারক হিসাবে কালিয়াচকে এসে পড়েছেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। তাঁর সময়োপযোগী পথনির্দেশ ও সহযোগিতায় কাঞ্চনতারকে কেন্দ্র করে আশে পাশের গ্রামগুলি, যেমন—কদমতলা, মল্লিকপাড়া, মহদীপুর, রামকেলী, খাসীমারি এবং আরও অনেক গ্রামে সঙ্ঘের শাখা চলতে থাকল। কাঞ্চনতার শাখা থেকে কয়েকজন বিস্তারক হিসেবেও অন্যান্য শাখায়

যায় তরুণ পণ্ডিতের প্রেরণায়। মাঝে মধ্যে খণ্ডের, কখনো মহকুমার সম্মিলিত কার্যক্রম হতো গ্রামে ও আশপাশের এলাকায়। তরুণ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন এক আদর্শ চরিত্র এবং এলাকার আশাভরসা। তার দেশপ্রেম, সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রত্যেককে আকর্ষণ করতে থাকল।

বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হয়ে কমলাবাড়ি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে তিনি যোগ দেন। খুব শীঘ্র আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছাত্রমহলে এবং এলাকায় সমাদৃত হন। বিদ্যালয়টি তার চেষ্টাতেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুমোদন লাভ করে। তার এই দক্ষতা পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকেও (যেমন কাঞ্চনতার হাইস্কুল) সাহায্য করেছিল।

তাঁর বসার ঘরে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় বেশ কিছু দেশবরেণ্য সন্তানদের ছবি। ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, স্বামী বিবেকানন্দ, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী ও সমর্থ স্বামী রামদাস এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নানারকম চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর চেষ্টায় পাড়াতে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। 'অরবিন্দ যোগমন্দির লাইব্রেরি ও ক্লাব', নামটি তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এলাকায় জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্বের আদর্শে নানারকম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ শুরু হতে থাকে। তার প্রভাবও সমাজে পড়তে থাকে। এককথায়, কাঞ্চনতার এবং এলাকার সমাজকল্যাণমূলক সমস্ত কাজ তাঁর নেতৃত্বে হতে থাকল। গ্রামে সরস্বতী শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর শিক্ষানুরাগেরই পরিচায়ক । কাঞ্চনতার গ্রাম-সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বেড়ে গেল যে এলাকার মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেকোনো সমস্যার সমাধানে আসতে থাকল।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। হোমিওপ্যাথির একটি কোর্স করে রেজিস্ট্রেশন নং নিয়ে বাড়িতে চলতে থাকল চিকিৎসা। তিনি অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেন। ভালো হবে না কেন, ওষুধ দিয়েছে যে তরুণ পণ্ডিত! তাঁর ব্যবহার ও কথাতেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠতেন। যে কোনো মানুষের অসুখবিসুখের খবরে তা মালদা শহরে বা কলকাতা,চেন্নাই যেখানেই হোক না কেন নিজেই ছুটে পাশে দাঁড়াতেন। সমস্ত রকম সহযোগিতা করতেন। তাঁর চেষ্টায় 'চক্ষু ছানি অপারেশন ক্যাম্প', একাধিক রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়মিত হতে থাকে। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, আশেপাশের গ্রামের লোকেদের সহযোগিতায় রথযাত্রা উৎসব শুরু করা। জগন্নাথদেবের রথোৎসবে এলাকার মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। এককথায় বলতে হয়, তরুণ পণ্ডিত ও সমাজ সমার্থক হয়ে পড়ল।

সাংবাদিক হিসেবেও তিনি পুরো উত্তরবঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মালদা প্রেস ক্লাবের এক অন্যতম সদস্য হিসেবে সবার প্রিয় ছিলেন। মালদা-সহ উত্তরবঙ্গের সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন। বহুদিন ধরে তিনি স্বস্তিকা পত্রিকায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ইদানীং যুগশঙ্খ পত্রিকায় তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। কয়েকদিন আগেই যুগশঙ্খে তাঁর লেখা 'রামমন্দির ঃ ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ' পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছিল। সেটিই তাঁর শেষ লেখা।

১৯৯৮ সালের বন্যায় স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে নিয়ে মাসাধিককালব্যাপী যেভাবে বন্যাকবলিত মানুষের পাশে সমস্তরকম সাহায্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে তরুণ পণ্ডিতের নেতৃত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কয়েকবছর আগে ব্যাসপুরে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় গভীররাত্রে ২৫-৩০ জন স্বয়ংসেবক নিয়ে তরুণ পণ্ডিত উদ্ধারকার্যে নেমেছিলেন। এরকম অনেক সেবাকাজ যা সমাজের লোকেদের কাছে তাঁকে অজাতশত্রুরূপে গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে যা একবারে বিরল।

এভাবে আশে পাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু সমাজে তার উপস্থিতি একটা অন্য মাত্রা নিয়েছিল। এলাকার শান্তি কমিটি, শ্মশান কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, বিভিন্ন মন্দির কমিটি প্রতিটি জায়গাতে তরুণ পণ্ডিত সম্পাদক বা সভাপতি হিসেবে আসন অলংকৃত করতেন। এলাকার হিন্দু সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সম্প্রতি পাতালচণ্ডী মন্দিরের গুরুত্ব এবং তার ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রমাণ সাপেক্ষে তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই লিখেছেন তিনি। কিছুদিন আগেই পাতালচণ্ডী কল্যাণ সমিতি 'সন্ত ঈশ্বর সেবা সম্মান' লাভ করেছে। সেটি প্রদান করেছেন রাষ্ট্রীয় স্তরের মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে।

গত ২৬/১১/২০২৩ বিকেল ৩টায় মালদা শহরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের একটি বৈঠক থেকে পাতালচণ্ডী মন্দিরের একটি বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছিলেন তিনি। শহরের কাছাকাছি যদুপুরে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেদিনই সন্ধ্যে ৬টা ৪৪ মিনিটে সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। সমাপ্ত হয় এই মহান কর্মবীর, সমাজসেবী, মানবদরদি এক আদর্শ শিক্ষকের জীবন। সমাজ হারালো এক বিশিষ্ট সমাজসেবীকে আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা হারালাম আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী, প্রাণের বন্ধুকে। সঙ্ঘ হারালো এক কার্যকর্তাকে, যিনি ডাক্তারজী, গুরুজীর আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

সেদিন হাজার হাজার মানুষ চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন এই বলে 'আর দ্বিতীয় কোনো তরুণ পণ্ডিতের জন্ম হবে না'। সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ওই শ্মশান কমিটিরও তিনি সভাপতি ছিলেন। সেদিন শ্মশান চত্বর ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছিল তার সভাপতিকে বরণ করা জন্য।

আমরা যারা তার সান্নিধ্যলাভ করেছি, তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আজ তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে না থাকলেও তার কাজের মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

(প্রতিবেদক : প্রয়াত তরুণ কুমার পণ্ডিতের বাল্যবন্ধু)

হর হর মোদী, ঘর ঘর মোদী

ড. রামানুজ গোস্বামী

মোদী---মোদী। মোদী---মোদী। জয়ধ্বনিতে উল্লসিত, আপ্লুত সারা দেশ। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরে এটাই ভারতের বাস্তব চিত্র। বিজেপি-বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ, কটূক্তি আর ব্যঙ্গকে ধূলিসাৎ করে দিল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়— এই রাজ্যের জনতা। রাজস্থান আর ছত্তিশগড়ে ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের আর মধ্যপ্রদেশে ফের একবার বিজেপি ফিরেছে রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে। মিজোরামেও বেড়েছে বিজেপির আসন সংখ্যা।

সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে কংগ্রেসের ঝুলিতে একমাত্র সম্বল হলো তেলেঙ্গানা। তবে উত্তর ভারতের পার্টি বিজেপি, নিন্দুকদের এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে তেলেঙ্গানাতেও বিজেপির আসন সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যথেষ্টই বেড়েছে। আসলে, এই সকল নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যভিত্তিক ভাবে তেমন একটা কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার বলে প্রোজেক্ট করেনি। ভোট হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নামে। সেখানেই বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। এটা আজ বিলক্ষণ সত্য যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার কাছে দেশের সমস্ত নেতাই ম্লান। তাই এই ঘটনা আগেও দেখা গিয়েছে যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা কোথাও কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও মোদীজীর নেতৃত্বে মোক্ষম সময়ে সেই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে ভোটে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এবারেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা গেল।

তবে এরই পাশাপাশি সারও কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য করতেই হয়। বিজেপির এই বিপুল ভোটে জয়ের পিছনে একদিকে যেমন রয়েছে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন ও বিকাশের 'গ্যারান্টি' যা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে; (পশ্চিমবঙ্গের মতো কিছু রাজ্যে উন্নয়ন থেকে রাজ্যবাসী বঞ্চিত রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও অসহযোগিতার কারণে) আবার অন্যদিকে রয়েছে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রবাদী আদর্শ যা আজ ভারতের কোটি কোটি মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে চলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, হযবরল মার্কা একটা তথাকথিত জোট (কিংবা ঘোঁট) বিজেপিকে হারানোর জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে। এই জোটের নাম 'I.N.D.I.A.'। এই জোট যে আসলে ভারতবিরোধী, হিন্দুবিরোধী, যে কোনও রকম দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত রাজনৈতিক দলগুলির একটা মিলিত প্রয়াস, তা তো বলাই বাহুল্য। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এতে জাতীয় দল কংগ্রেসের পাশাপাশি এই রাজ্যের শাসক তৃণমূলও আছে। রয়েছে চুনোপুঁটি আরও কিছু দলও। এদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, এই নির্বাচনে বিজেপি একেবারে পর্যুদস্ত হবে।

তাই বাজারি পত্রপত্রিকা আর সেই সকল টিভি চ্যানেল, যারা দিনের ২৪ ঘণ্টা ধরেই বিজেপি-বিরোধী, হিন্দুত্ব-বিরোধী প্রচার চালায় তাদের উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। কিন্তু সাধারণ জনতা, যারা মোদীজীর নিঃস্বার্থ দেশভক্তি তথা দেশপ্রেমকে চিনেছে, জেনেছে, বুঝতে পেরেছে— তাদের এত সহজে কি বোকা বানানো যায়! তাই খড়কুটোর মতো মোদীঝড়ে উড়ে গেল সকল অপপ্রচার। আজকের ভারত কংগ্রেসের আমলের পিছিয়ে থাকা ভারত নয়। এই ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, যা শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠতে চলেছে। এই ভারত দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত প্রবল শত্রুই হোক না কেন, তাদের পরাজিত করতে সক্ষম। সারা বিশ্ব আজ ভারতকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই।

তাই তিনি সারা বিশ্বের জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনায়ক। সারা ভারত তাই আজ স্বপ্ন দেখে উন্নতির, বিকাশের আর সুরক্ষার। কারণ তাদের মনে বিশ্বাস আছে যে— 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। তাই ঘরে ঘরে স্লোগান উঠেছে 'হর হর মোদী, ঘর ঘর মোদী'।

নিঃসন্দেহেই ২০২৪-এ আবার হতে চলেছে মোদী-সুনামি। পরিবারতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, দুর্নীতি, অকথ্য নির্লজ্জ তোষণের রাজনীতি, দেশের সুরক্ষার সঙ্গে আপোশ ইত্যাদি আর ভারতের সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। কারণ, এটা নতুন ভারত যার সার্থক রূপকার হলেন নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য যে, I.N.D.I.A. জোটের অন্তর্গত দলগুরি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যেনতেন প্রকারণে মুসলমান ভোটব্যাংক অটুট রাখা এবং তার জন্য দেশকে যদি 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর হাতেও তুলে দিতে হয়, তো এই সব নেতা-নেত্রীরা সেবিষয়েও রাজি আছেন। এরই সঙ্গে রয়েছে মাঝে মাঝে একটু মেকি হিন্দুপ্রেমী সাজার কৌশলও। কিন্তু সত্যিই যদি এরা দেশের কথা বা দেশের মানুষের কথা ভাবতেন, তো সিএএ বা এনআরসি নিয়ে আপত্তি তুলতেন না, বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন, হিন্দুপ্রধান দেশে হিন্দুর উপরে অত্যাচার হতে দেখলেও চুপ করে ভোটব্যাংকের কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না। কিন্তু এগুলোই এরা করে থাকেন। তাই ২০২৪-এ এদের জয়লাভের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এবারে একনজরে দেখে নেওয়া যাক বিজেপির এই অনবদ্য ফলাফলের কারণ—

১। কংগ্রেসের caste politics মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২। I.N.D.I.A. জোটের দলগুলির নানাবিধ কটূক্তি আর কুৎসিত মন্তব্য মানুষ ভালো চোখে নেয়নি।

৩। মানুষ রায় দিয়েছে বিকাশ আর সুরক্ষার ভিত্তিতে।

৪। সনাতনী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় আদর্শের জয় হয়েছে।

৫। মোদী-ম্যাজিক অটুট রয়েছে।

সবশেষে এটাই বলবার যে, এমনিতেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি অন্যান্য বিরোধী দলগুলির থেকে যথেষ্টই এগিয়ে রয়েছে লোকসভা নির্বাচনের বিষয়ে; কিন্তু এই বিধানসভাভিত্তিক ফলাফল একেবারে নিশ্চিত করেই দিল যে, মোদীজীর হ্যাটট্রিক এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কংগ্রেস-সহ সকল বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীদেরই এটা বোঝা দরকার যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোদী-ম্যাজিক ফিকে তো হয়ইনি, বরং দেশবাসীর মনে পাকা আসন্ন করে নিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা যে কথা বলেছেন সেটাই হতে চলেছে। ওমর আবদুল্লার আশঙ্কা যে, I.N.D.I.A. জোটের দলগুলি যদি এইভাবে একের পর এক নির্বাচনে হেরে যেতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত সেই জোটের অস্তিত্বই থাকবে না, কারণ সকলেই শেষ হয়ে যাবেন রাজনৈতিকভাবে।

এটাই বাস্তব সত্য। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ সকল বিজেপি বিরোধী দলই এটা যত দ্রুত বুঝতে পারে, ততই ভালো। কারণ, এই ভারত হলো 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'। এই নতুন ভারতের আরেক নামই হলো নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

পাকিস্তানে হিন্দু মন্দির ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তানে হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছে পশুখামার। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে পাকিস্তানের সাদিকাবাদের আহমেদপুরে লুম্মা শহরের একটি মন্দিরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এবং পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দেখা গিয়েছে, এই মন্দির চত্বরে তৈরি করা হয়েছে পশুখামার। যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু, ছাগল ও হাঁস। তাদের মলমূত্রে গোটা চত্বর নোংরা হয়ে আছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা এই বিষয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ও উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। তারা হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের সম্মান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত এই সংকটের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ঘটনা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফাঁকগুলি তুলে ধরে বলেই মনে করছেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে পাকিস্তানের এই শহরেই একটি কৃষ্ণ মন্দিরকে মাদ্রাসা ও মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

গলে যাচ্ছে স্কটল্যান্ডের স্ফিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্ফিংস বললেই মিশরের পিরামিডের কথা মনে পড়ে। তবে স্ফিংসের আরও একটি পরিচয় আছে। স্কটল্যান্ডেও আছে স্ফিংস। এটি স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি ধরে স্থায়ী হয়ে থাকা এক বরফখণ্ড। এই বরফের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো এটি প্রায় সারা বছর ধরেই থাকে। সহজে গলে না। কিন্তু সম্প্রতি স্ফিংস চিন্তায় ফেলেছে বিজ্ঞানীদের। কেননা কেয়ার্নগর্মের দূরবর্তী ব্রেইরিয়াখের এই বরফখণ্ডটির গলনের মাত্রা এখন বেড়ে আছে। তবে এক বা দু'বছর নয়, বিগত ১৮ বছর ধরেই স্ফিংসের গলনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল, আর এখন প্রচুর পরিমাণে গলছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনকে অনুসরণ করে বলা যায়, গত ৩০০ বছরের মধ্যে ৮ বার গলেছে স্ফিংস। এতে গত ১৮ বছরের মধ্যে মোট ৪ বার গলেছে এই বিশালাকার বরফখণ্ডটি। তথ্য বলছে এর আগে ১৯৩৩, ১৯৫৯, ১৯৯৬, ২০০৩, ২০০৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে স্ফিংস গলে গিয়েছিল। ১৯৩৩ সালের আগে শেষবারের মতো ১৭০০ সালে এটি সম্পূর্ণ গলে গিয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তুষার বিশেষজ্ঞ ক্যামেরনের মতামত এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি জানান, স্ফিংস গলে যাওয়ার পিছনে অন্যতম বড়ো কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। বিশ্ব জুড়ে যেভাবে উষ্ণায়ন বাড়ছে, বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব বাড়ছে, তার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বাড়ছে। এইসবই স্ফিংসের গলে যাওয়ার পিছনে দায়ী।

যদিও এর পিছনে অন্যান্য অনেক কারণই আছে তবে জলবায়ুর পরিবর্তনকে অন্যতম প্রধান যুক্তি বলে তিনি মনে করছেন। গবেষক ক্যামেরন এই বিষয়টি নিয়ে 'দ্য ভ্যানিশিং আইস' নামের একটি বইও লিখেছিলেন, যা প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি স্ফিংস গলে যাওয়ার ঘটনাকে স্কটল্যান্ডের তুষার ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

শুধু স্ফিংসই নয়, লোচাবেরের বেন নেভিস রেঞ্জ-সহ স্কটল্যান্ডের পর্বতমালার অনেক তুষারাবৃত অঞ্চলকে এই জলবায়ু পরিবর্তন আঘাত করেছে এবং সেই কারণে পুরু তুষারে ঢাকা এলাকার বরফ যে অনেকখানি গলেছে তা-ও ক্যামেরন জানান। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের গবেষণা থেকে ইতিপূর্বেই আমরা অনেক ছোটো তুষারও জমাট বাঁধতে দেখেছি। তবে আশি ও নব্বইয়ের দশকের তুলনায় এখন অনেক কম বরফ পড়ছে'।